ইউনিট ৩: উন্নত ও উন্নয়শীল দেশের শিক্ষা

ভূমিকা

পৃথিবী জুড়েই তুলনামূলক শিক্ষা একটি চর্চার বিষয়। প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের নিরিখে, শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন সময়ে ও নানা পরিস্থিতিতে একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারা বেশ পরিবর্তিত হয়। আবার একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপাদান ও পরিবর্তনমূলক বিষয়াদি চিহ্নিতকরণ, নিজ দেশের শিক্ষার প্রাথমিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানে তুলনামূলক শিক্ষা বিশেষ অবদান রাখে। তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গুণগতমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন সম্ভব। শিক্ষা সংস্কার যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও পর্যালোচনা নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আর্ন্তজাতিক মানের কোন পর্যায়ে আছে তা পরিমাপ করা যায়।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক উদ্ভাবনী কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষার নতুন নতুন প্রযুক্তি, গণমাধ্যম ব্যবস্থা, ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতিকরণ ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পরিচালনা, কেবলমাত্র তুলনামূলক শিক্ষার পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বিস্তার ঘটেছে। তুলনামূলক শিক্ষা ও ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে কেবল এর গভীরে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অধ্যয়ন বা বিশ্লেষণ করে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমৃদ্ধ করার পথ খুঁজে পাওয়া যায়– তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবেশিত করে নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব।

পাঠ ৩.১ : শিক্ষার বিভিন্ন স্তর
পাঠ ৩.২ : সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা (প্রাথমিক)
পাঠ ৩.৩ : মাধ্যমিক শিক্ষা: উদ্দেশ্য, সুপারিশ, শিক্ষাব্যবস্থা
পাঠ ৩.৪ : উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা: (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ) (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মালয়েশিয়া ও জাপান)
পাঠ ৩.৫ : বয়স্ক শিক্ষা: Adult Education (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ)
পাঠ ৩.৬ : উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা
পাঠ ৩.৭ : উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ ৩.৮ : বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা
পাঠ ৩.৯ : শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
পাঠ ৩.১০ : উচ্চশিক্ষার স্তরে মূল্যায়ন
পাঠ ৩.১১ : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি

পাঠ ৩.১: শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রচলিত "আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা" বর্ণনা করতে পারবেন।
- আধুনিক শিক্ষা স্তর উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে নবতর সংস্কারগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো দেশীয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণ। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষে হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত ছিল। পরবর্তীতে ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা-গামা কর্তৃক জলপথ আবিস্কারের পর এ উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পড়ে এবং পর্তুগীজ মিশনারি শিক্ষাবিদগণকেই ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তনকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশে প্রবর্তিত শিক্ষার ধারা এবং কাঠামো তাদেরই প্রবর্তিত শিক্ষা কাঠামোর উন্নত সংস্করণ।

প্রতিটি দেশেই শিক্ষার উন্নয়নে তার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তী উন্নয়নের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে কিংবা সম্পূর্ণ নষ্ট করে শিক্ষার কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় না। কারণ যে কোন দেশের কোন শিক্ষাব্যবস্থাই পরিপূর্ণরূপে দুর্বলতামুক্ত বা দোষত্রুটি বিবর্জিত হতে পারে না। যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে সে বিদ্যমান দোষত্রুটি দূর করা যেতে পারে। ধ্বংস করে নয়।

ইংল্যান্ডের মত উন্নত দেশের জনসাধারণের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে গিয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কিছু ভলেনটারি স্কুল হাতে নেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে প্রকৃত অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এভাবেই যদি প্রাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ দেওয়া যেত তবে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হত। তাই, দেশে সুষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হল দেশীয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে মূলভিত্তিকে রেখে শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এক্ষেত্রে উইলিয়াম এডাম অত্যন্ত জোরাল মন্তব্য ব্যক্ত করেন যে, দেশবাসীর আস্থা ব্যতিরেকে দেশবাসীর জন্য উন্নতিমূলক কোন কাজে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন– "To labour successfully for them. We must labour with them, and to labour successfully with them. We must get them to labour willingly and intelligently with us".

আমরা জানি, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাস অনেকাংশে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা এবং প্রগতিশীল তার তাগিদে এর আরও কিছু সংস্কার আবশ্যক। প্রগতিশীল বিশ্বের শিক্ষার উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় সমন্বয়ের তাগিদে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাস করা হয়েছে এবং আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নতুনত্বের সংযোজন হয়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন এবং তাদের সুপারিশ কাজে লাগানো

হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এর চেতনাকে বাস্তবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

ক. সাধারণ শিক্ষা (General Education)
খ. মাদরাসা শিক্ষা (Madrasa Education)
গ. কারিগরি শিক্ষা (Teachical Education)

বর্তমান ঐ শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে মিল রেখে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এর প্রধান শিক্ষা স্তরগুলো হলো–

- প্রাথমিক শিক্ষা স্তর
- মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর
- উচ্চ শিক্ষা স্তর

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে যদিও আনুষ্ঠানিক স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়নি তথাপি এ শিক্ষা বেসরকারি উদ্যোগে দেশের প্রায় সব শহরেই চালু রয়েছে। এ স্তরে শিক্ষাক্রম সমন্বয়ের ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে করা ছাড়াও শিক্ষার্থীর বয়স ৪-৫ বছর নির্ধারণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর

বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ৬-১১ বছর বয়সের শিশুরা ৫ বছর মেয়াদী (১ম-৫ম শ্রেণি) প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এ স্তরের শিক্ষা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রেজিস্টার্ড এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণিতে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা আছে। অন্য বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই তবে শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ ও তথ্য পুস্তিকার ব্যবস্থা রয়েছে। ৩য়-৫ম শ্রেণির জন্য সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন– মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম), শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সংগীত।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো স্তরের দ্বিতীয় স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা। বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর তিনটি উপস্তরে বিভক্ত। যেমন–

১. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)
২. মাধ্যমিক স্তর (৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)
   এই স্তর: (ক) মানবিক শাখা (খ) বিজ্ঞান শাখা (গ) ব্যবসা শিক্ষা শাখায় বিভক্ত রয়েছে।
৩. উচ্চ শিক্ষা স্তর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)।
   উচ্চ মাধ্যমিক স্তর: (ক) বিজ্ঞান (খ) মানবিক (গ) ব্যবসায় শিক্ষা (ঘ) গাহর্স্থ্য বিজ্ঞান (ঙ) ইসলামি শিক্ষা। এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত।

বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা, মাদাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা ও ভোকেশনাল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সকল ধারায় বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিকের শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন, সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ, গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি,

কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা চালু, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষকের যোগ্যতার আদর্শমান নির্ধারণ পরীক্ষা পদ্ধতি একাডেমিক বর্ষপুঞ্জী অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষাস্তর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পর মেধানুসারে কলেজে ৩ বছরের পাশ (ডিগ্রি) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের সম্মান ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হয়। যে সকল শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি পাশ কোর্স থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হয় তাদের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রির মেয়াদ দুই বছর এবং সম্মান ডিগ্রি ধারিদের জন্য এক বছর। এর উর্ধ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

নবতর জ্ঞানের আলোকে উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসসমূহ পরিমার্জন করা, উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির যোগ্যতা হবে মেধা, কিছু কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের একাধিক কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা, স্নাতক পাশ কোর্স ৩ বছর ও স্নাতকোত্তর কোর্স ২ বছর করা, ৪ বছরের সমন্বিত সম্মান কোর্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু করা, খন্ডকালীন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চ শিক্ষার সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবিধা প্রদান, ১০০ নম্বরের ইংরেজি বিষয় সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও কনসালট্যান্সির ব্যবস্থার গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সংস্কার প্রস্তাবের পাশাপাশি কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ আছে নানাবিধ সংস্থা। সংস্থা ও সংস্কারসমূহের মধ্যে সমন্বয় করেই বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রশাসনিক জটিলতা, বাস্তবায়নকারী অংশীগণদের মনোভাব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়েই সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আর শিক্ষার অবিরত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিক্ষার কাঙ্খিত গুণগত মান অর্জন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
   ক. ৫ ভাগে
   খ. ৪ ভাগে
   গ. ৩ ভাগে
   ঘ. ৬ ভাগে

২. বাংলাদেশের প্রধান শিক্ষাস্তর কয়টি?
   ক. ৫টি
   খ. ৪টি
   গ. ৭টি
   ঘ. ৩টি

৩. প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর শ্রেণিভিত্তিক কয়টি উপস্তরে বিভক্ত–
   ক. ২টি
   খ. ৩টি
   গ. ৫টি
   ঘ. ৪টি

উত্তরমালা: ১। গ, ২। ঘ, ৩। খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো কোন প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণ।
২. বাংলাদেশের প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কোন্ শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাস্তরের বর্ণনা দিন।
২. আধুনিক শিক্ষাস্তরের নবতর সংস্কার সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।
৩. নবতর জ্ঞানের আলোকে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষার ধারা এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

পাঠ ৩.২: সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা (প্রাথমিক)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্বজনীন (প্রাথমিক) বাধ্যতামূলক শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন কর্তৃক সুপারিশ ও সংস্কারসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্খা রূপায়ণের ও ভবিষ্যত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। দেশের সকল শ্রেণির জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্যত অর্জন এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। তদুপরি শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় মূলনীতির সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে। (কমিশন রিপোর্ট: ১৯৭৪:৪), কমিশন শিক্ষার মূলনীতির সাথে জাতীয় নীতিমালার যোগ সাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। কমিশনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে:

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, বিশ্ব নাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক রূপান্তরের স্বরূপ শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী এক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূলে, শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির জন্য শিক্ষা"।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

- তিন বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।
- পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা (১ম-৫ম শ্রেণি)।
- তিন বছর মেয়াদী নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি)।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষা স্তরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বনিম্ন স্তরে এ বয়সের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার তাৎপর্য তুলে ধরে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। যেমন–

ক. প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের পূর্বে শিশুদের পঠন পদ্ধতি ও সংখ্যা পরিচিতি এবং ভাল-মন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
খ. শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।
গ. ভবিষ্যতে সুষম ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপনের জন্য যথারীতি সহায়তা করা।
ঘ. খেলাধুলা ও আনন্দদায়ক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুর পঠিত অভ্যাস সৃষ্টি করা।
ঙ. প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের প্রস্তুতির জন্য শিশুদেরকে শোনা, বলা ও লেখার সঙ্গে পরিচিত করা।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে শিক্ষার এ স্তরটিকে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার মত প্রকাশ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শহর ও উপজেলা পর্যায়ে ও অনেক কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশ ব্যক্তি মালিকানায় ও ব্যবসায়িকভিত্তিতে পরিচালিত। সীমিত স্থান, আলো বাতাসহীন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের স্বাভাবিক বিচরণ অবস্থায় এই বিদ্যালয়গুলো চলে। শিশুর বিকাশ ও শিক্ষাক্রম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মত ও ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত হয়। এছাড়া এসব বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিশু শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত নন। ফলে শিশুদের স্বাভাবিক শিক্ষার ধারাকে শ্লথ এবং রূদ্ধ করে অনেক ক্ষেত্রে ধারণ ক্ষমতার বাইরে অসম্ভব পাঠের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি, পরীক্ষা ও মূল্যযাচাই ত্রুটিপূর্ণ ও শিশু বিকাশের সহায়ক নয়।

পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করে।

সুপারিশ মালায় বলা হয়–

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ণ করবে। প্রয়োজনে ইউনিসেফ ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি পৃথক শাখা খোলা প্রয়োজন।
গ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতা নির্ধারণ এবং বেতন কাঠামো স্থির করবে।
ঘ. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিবন্ধীকরণ এবং সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন হতে হবে।
ঙ. এই সকল বিদ্যালয়ের মান-নিয়ন্ত্রণের ভার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও আঞ্চলিক শিক্ষা অধিদপ্তরগুলোর উপর দিতে হবে।
চ. শহর ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবি মা-বাবার শিশুদের জন্য শিশু নীড় গড়ে তোলা এবং এই সব শিশু নীড়ে অবশ্যই খেলাধুলা ও পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ছ. প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষকদের যোগ্যতা অন্তত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের সম-মানের হতে হবে পাশাপাশি পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকবে। ফলে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা, শিশু সাহিত্য, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান, খেলাধুলা, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

অতএব প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন–

- সরকার কর্তৃক ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে একটি ইতিবাচক মনোভাব গঠন ও সুগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম প্রচলন এবং উদ্বুদ্ধকরণ।
- শিশু শিক্ষার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সর্বস্তরে বিতরনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে (তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর) শিক্ষা যথাযথ জ্ঞান এবং শিখনে ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষকদের বেতনক্রম ও নিয়োগনীতি বিধি প্রবর্তন।

- শিশু-শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করতে হবে। কারণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন ও বিকাশ, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া নয়।
- বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়মিতকরণে ২০০৩ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন- ৬: কুদরাত-এ-খোদা কমিশন প্রতিবেদন (১৯৭৪), প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয় তা হলো–

বর্তমান বাংলাদেশে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। স্বাধীনতার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে (১৯৭০ সালে) প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়।

"বাংলাদেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও ফল হিসেবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। যা পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ভিত্তি রচনা করবে। এই ভিত্তি ভূমিকে দুর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী রূপে গড়ে তোলা সম্ভব নয়"। (শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট: ১৯৭৪: ২৩)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার ৪টি মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। এগুলো হচ্ছে:

- শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।
- শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন।
- মাতৃভাষায় লিখন, পঠন, হিসাব রক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে যে সকল মৌলিক জ্ঞান প্রয়োজন এবং কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিতকরণ।
- পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যোগ্যতা অর্জন। (শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট: ১৯৭৪:২৩)।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এবং উদ্দেশ্য সাধনে কিছু সুপারিশ করে। যেমন–

পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮ সালে), (১৯৭৩-৭৪) সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবেদনের বিষয়াদি সমর্থন করে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে "শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দিকসমূহের বর্ধন ও অগ্রগতি নিশ্চিত" করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে (শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট: ১৯৮৮:৬১)। এ লক্ষ্য সাধনে কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার দশটি উদ্দেশ্য নিরূপন করে। যেমন–

- দেশ, দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।
- স্বাক্ষরতা, সংখ্যা ও সংখ্যার ব্যবহার সম্পর্কে মৌলিক যোগ্যতা অর্জন।
- বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জন এবং সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সাধন।
- পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের অভ্যাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
- সকল নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গঠন।
- ব্যক্তি, পরিবার-সদস্য, সমাজ-সদস্য, সুনাগরিক হিসেবে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

- জাতীয় সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ধারণা নেয়া ও শ্রদ্ধাবোধ জাগানো।
- ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করা। সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মান এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।
- শিক্ষা ও কার্যকারিতায় সংযোগ স্থাপন এবং কাজ ও শ্রমের মর্যাদার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

এ কমিশন ও (১৯৮৮) অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন পরবর্তীতে (২০০৩)-এর শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। (অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা) জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) মানসম্মত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এ কমিশন সম্পদের সীমাবদ্ধতা, ব্যবস্থাপনাগত অসুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছরে রাখার পক্ষে মত দেয়।

বাংলাদেশে এ যাবত গঠিত অধিকাংশ শিক্ষা কমিশন ও কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছরের স্থলে ৮ বছরের প্রবর্তনের সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে ১ম-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত, অবৈতনিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক মহিলা শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই ধরনের পাঠ্যসূচি/পাঠ্যক্রম চালুকরণ, বাংলা হবে শিক্ষার মাধ্যম, প্রতি গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক কর্মচারীর চাকুরি জাতীকরণ, সকল কে-জি স্কুলসহ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নিবন্ধীকরণ, শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য পৃথক শিক্ষক কর্ম কমিশন গঠন, বিদ্যালয়ে বাংলা, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, পরিবেশ পরিচিতি, তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি চালুকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ, শ্রেণিগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুতকরণ, উপবৃত্তি সম্প্রসারণ, ৫ম ও ৮ম শ্রেণি শেষে পরীক্ষা (বৃত্তি ও সমাপনী), বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রদানসহ কমিটি সচল রাখা। ২০১০-২০১১ সালে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:৩৩/১:৩৫ করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা প্রচলন। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ যেমন– থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকায় ৬ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে।

তবে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদী রাখার যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। যেমন–

- প্রাথমিক শিক্ষায় দেশের বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য সমাপনী স্তর।
- বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এ স্তরের শিক্ষা শেষে জীবন ও জীবিকার জন্য বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে শ্রম বাজারে প্রবেশের চিন্তা করতে হয়।
- এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে উপযোগী নয় বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। (জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩)। কমিশন প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদী চালু রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। কারণ বিদ্যামন প্রাথমিক স্কুলগুলোর অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষাগত স্বল্পতা, শ্রেণিকরণ স্বল্পতার অভাবে অনেক স্কুল দুই শিফটে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং সে অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করেই কেবল ১ শিফটে বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি করে কেবলমাত্র শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

বর্তমান বাংলাদেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে–

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- আনরেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;

- উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়;
- কিন্ডার গার্ডেন স্কুল;
- স্যাটেলাইট বিদ্যালয়;
- এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- এবতেদায়ি মাদাসা;
- কমিউনিট বিদ্যালয়।

এই ১১ ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে স্যাটেলাইট ব্যতীত অন্য বিদ্যালয়ে ৫ বছরের শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে ঐ বিদ্যালয়ের মাদার স্কুল হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষা সমাপন করে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের শিশুরা মাদার স্কুলে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো মূলত শিশুদের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বিদ্যালয়ে স্থানীয়ভাবে দু'জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ এবং সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা প্রদান করা হতো, তবে ২০০৪ সালের পর থেকে এগুলো বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। শিক্ষার চাহিদা ও ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নতুন নতুন বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাংবিধানিক দায়িত্ব কর্তব্য সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন নানামুখী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। পাশাপাশি মানসম্মত সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা। তাই বাংলাদেশে বর্তমানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার পরিমাণগত (Quantilty) উন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত (Quanlity) মানোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

রাজনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াসে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি সরকারই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে ঠিকই সামগ্রিকভাবে কোন কমিটি বা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবাদন না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বিভিন্ন সরকার বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে, ফলে শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। যেমন– মেয়েদের বর্ধিত শিক্ষার হার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন। সরকার বিভিন্ন সংস্থা ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের কাজগুলো বাস্তবায়ন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলতে বুঝায়–
ক. দেশের সকল শ্রেণির জনগণের শিক্ষা গ্রহণ
খ. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন
গ. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা
ঘ. শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাধিকার দেওয়া

২. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে–
ক. সরকার কর্তৃক ইতিবাচক মনোভাব গঠন
খ. শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ
গ. নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ
ঘ. শিক্ষকদের বেতনক্রম ও নিয়োগনীতি প্রবর্তন

৩. প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কয়টি–
ক. ৫টি
খ. ২টি
গ. ৭টি
ঘ. ৪টি

উত্তরমালা: ১। ক, ২। সবকটি, ৩। ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের সুপারিশগুলো উল্লেখ করুন।
২. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদী করার যুক্তিসঙ্গত কারণগুলো উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে কোন কোন বিষয়কে অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮)-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. বর্তমান বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা উল্লেখ করুন।
৩. একটি জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কি ধরনের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা উত্তোরনের উপায় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন।

পাঠ ৩.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা: উদ্দেশ্য, সুপারিশ, শিক্ষাব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা কমিশন কর্তৃক সুপারিশসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন। (ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা শিক্ষা সম্পর্কে)।

ভূমিকা

একটি সার্বভৌম বাংলাদেশকে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা, দেশকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, একটি আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক যুক্তিনির্ভর সমাজ গড়ে তোলা, দেশকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সুদৃঢ় ও সুসংহত করা, বিশ্ব পরিস্থিতিতে অভিযোজন করা, কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা, প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় কোনো বিকল্প নেই। উন্নত দেশসমূহ ইতিমধ্যে সময়ের বিবর্তনে প্রযুক্তির উন্নয়নে, জ্ঞানের নবতর বিকাশে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করে উন্নয়নের শিখরে অবস্থান করছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধরায় গমন করবে নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তর কালের শিক্ষা। নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণেল জন্য, সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন কর্তব্যবোধে সৎ ও প্রগতিশীল দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষা দান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংগত করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারার অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯টি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন–

১. **শিক্ষার মাধ্যম:** শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত: বাংলা। সামর্থানুযায়ী দ্বিতীয় ভাষা অনুসারে ইংরেজি মাধ্যমে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে পারে। পাশাপাশি বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত:** শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীত করতে হবে।

৩. **শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক:** মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের প্রত্যেক ধারায় কয়েকটি শাখা থাকবে। প্রতি ধারায় কয়েকটি মৌলিক বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে। যেমন– বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, এছাড়া অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি ধারায় সংশ্লিষ্ট ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হবে।

৪. **বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা:** দেশের প্রয়োজন ছাড়া ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। তাই অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৫. **মাদাসা শিক্ষা:** মাদাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জীবন ধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ও উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. **নৈতিক শিক্ষা:** ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরনগত উন্নয়ন, জীবন ও সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ও মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনে সহায়ক করবে।

৭. **উচ্চ শিক্ষা:** শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় পারস্পরিক নির্ভরশীল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ডিগ্রি কোর্সে ১০০ নম্বরের ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৮. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** মানসম্পন্ন শিক্ষা ও সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ করা। অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা। গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাদি বিশ্লেষণ দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এর গবেষণা কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

৯. **শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব:** শিক্ষার সকলের স্তরেই শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয় গভীরভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যাতে তারা যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

১০. **শিক্ষা প্রশাসন:** সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ও প্রশাসনে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিতামূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে গতিশীলতা আনয়ন করে শিক্ষা মানোন্নয়নে উৎকর্ষ সাধন করবে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোন নীতিই চিরস্থায়ী, স্থির ও অবিচল হওয়া উচিত নয়। সময় ও অবস্থার প্রয়োজনে অন্যান্য নীতির ন্যায় শিক্ষানীতিতেও রদবদলের সুযোগ থাকবে, সার্বিক ও বৃহত্তর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যালোচনার ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, দেশ ও সমাজ হতে আরো যুগপোযোগি হবে, হবে সমৃদ্ধ ও উন্নত।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন কমিশন কর্তৃক সংস্কারমূলক সুপারিশ

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরের শিক্ষার সমৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠিত করা। তাই আমাদের মাধ্যমিক স্তর এদেশের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের মাঝে সেতুবদ্ধ হিসেবে কাজ করে। কাজেই আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশে শিক্ষায় বিভিন্ন সুপারিশ প্রদানে বিভিন্ন কমিশন সরকার ও তার আদর্শ মতে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। এ কমিশন রিপোর্টগুলির মধ্যে ড. কুদরাত-এ-খোদা কর্তৃক প্রদত্ত কমিশনের রিপোর্টটিকেই উত্তম বলে গ্রহণ করা হয়। কেননা এটি একটি আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, সুদূরপ্রসারী, সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিবেদন। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীতে কাজী জাফর আহম্মদ, আবদুল বাতেন, অধ্যাপক মফিজউদ্দিন, মুহাম্মদ আব্দুল বারী ও প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত কমিশন কর্তৃক রিপোর্ট প্রদান করলে ও সরকারের রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে কিছু কিছু ভিন্নতর প্রস্তাব করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে ড. কুদরত-এ-খোদা রিপোর্টের ভিত্তিতে অধ্যাপক শামছুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সর্বশেষ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক শামছুল হকের নেতৃত্বে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০০০-এর আলোকে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। গঠিত কমিটিগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ও বিজ্ঞান মনস্ক মানবসম্পদ তৈরি, মাদাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক প্রসারসহ যুগপোযোগী শিক্ষানীতির আলোকে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ফলশ্রুতিতে মূলত এ তিনটি কমিটির ধারাবাহিকতার কারণেই একটি সর্বজনীন শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত যে সকল বিষয় সংস্কারের সুপারিশ করে তা হলো–

- নবম-দ্বাদশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা চালুকরণ;
- উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসমূহে ডিগ্রি কোর্স চালু না করা;
- মাধ্যম হবে বাংলা;
- ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বাতিল করা;
- উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে আংশিক মাধ্যমিক এবং বাকি অংশে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা;
- ক্যাডেট কলেজসমূহ সামরিক ব্যবস্থাপনায় চলবে;
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সময়োপযোগী করা;
- বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্বরোপ;
- বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- বিদ্যালয় স্থাপন ও টিউটোরিয়াল কোচিং চালুকরণ;
- মাধ্যমিকের সকল ধারার অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রচলন;
- কোচিং সেন্টার বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১:৪০/১:৩০ এ রাখা;
- বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন;
- দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিকের শিক্ষক নিয়োগ;
- শিক্ষকের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন;
- সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ;
- গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি;
- মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন;
- মাধ্যমিক শিক্ষকের যোগ্যতার আদর্শমান নির্ধারণ;
- একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি চালুকরণ;
- শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ;
- তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ডিজিটালকরণ;

- সকল স্তরে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ;
- আমলাতান্ত্রিক প্রভাব হ্রাসকরণ;
- শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরণ।

উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে নিজেদেরকে অবশ্যই যথার্থ যোগ্যতায় ও প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা অর্জন অথবা অর্ন্তভুক্ত হতে হবে। কারণ উন্নত বিশ্বের শিক্ষানীতি, শিক্ষা চেতনা, শিক্ষা কাঠামো, শিক্ষা স্তর শিক্ষা ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে কাঙ্খিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করে দক্ষতা ও অভিজ্ঞার আলোকে কর্মকৌশল প্রয়োগ করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাই বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে কতিপয় নির্বাচিত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা অপরিহার্য। যেমন– ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

১৯৬৮ সালে কোঠারি কশিনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার মধ্যে যে সব গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখিত করা হয় তা হলো–

- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ।
- সংবিধানুযায়ী ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি কার্যকর করা।
- নারী শিক্ষা, স্বাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।
- বাধ্যতামূলকভাবে কর্ম-অভিজ্ঞতার সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করা।
- শিক্ষার মানোন্নয়নে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন, সামাজিক সম্মান ও পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান, গণিত, তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা।

জাপান শিক্ষাব্যবস্থা

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে জাপানের সংবিধান কার্যকর করা হয়, যার মধ্যে জনগণের শিক্ষার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। সংবিধানের এই মর্মবাণীকে প্রতিফলিত করে ১৯৪৭ সালে শিক্ষার মৌলিক আইনে জাপান একটি গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জনগণকে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার এই আইনে আরও একটি মূলনীতি নির্ধারিত হয় যা হল–

- সকলের নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার সমান সুযোগ পাবে।
- জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, মতাদর্শ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ভেদে কোন বৈষম্য থাকবে না।
- সহ শিক্ষা বৈধ বলে গণ্য করা হবে।
- সামাজিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়।
- জাপানের শিক্ষার চারটি স্তর রয়েছে। যেমন– কেজি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা।
- ১ম-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

- মাধ্যমিক শিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক (৭ম-৯ম শ্রেণি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (দশম-দ্বাদশ শ্রেণি) অংশে বিভক্ত। উচ্চ মাধ্যমিকের পর শিক্ষার্থীরা সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর বয়স হবে ১১$^{+}$ - ১৮$^{+}$ বছর পর্যন্ত।
- জাপানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সনদপত্র নিতে হয়।
- মাধ্যমিক শিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক (৭ম, ৮ম, ৯ম) ৩ বছর মেয়াদী ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকাল (১০ম, ১১শ, ১২শ) ৩ বছর মেয়াদী, স্কুলে পরিচালিত হয়।
- ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হয়।

মালয়েশিয়া শিক্ষাব্যবস্থা

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার বর্তমানে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রবেশ করেছে। মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা চার ধাপে বিভক্ত। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীকে সরকারি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে হয়। এছাড়া শিক্ষার কেন্দ্র বিশেষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন–

- মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি ধাপ অনুসৃত হয়। একটি মালয়েশিয়ান অন্যটি ব্রিটিশ কারিকুলামের যা জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশনের সমমানের।
- নিম্ন মাধ্যমিক তিন বছর (৭ম - ৯ম শ্রেণি), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির জন্য নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ স্তরের শিক্ষাকাল দুই বছর (১০ম-একাদশ) এবং এরা পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
- মাধ্যমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীর সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।
- মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রমের প্রধান লক্ষ্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং তার সম্প্রসারণ করা।
- মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা, পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উপযুক্ত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা।
- ১৯৮৮ সাল থেকে মাধ্যমিক স্কুলে সমন্বিত কারিকুলাম চালু করা হয়।
- মালয়েশিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও অবৈজ্ঞানিক কিছু বাধ্যতামূলক নয়।
- সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত।
- শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ডিসেম্বরে এবং শেষ হয় অক্টোবরে।
- ইসলাম ধর্ম শিক্ষকদের জন্য পৃথক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে এবং শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
- মাধ্যমিক শিক্ষা ৩ স্তরে বিভক্ত। যথা– নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক উত্তর উচ্চ শিক্ষা। এ স্তরের শিক্ষা একাডেমিক, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল স্কুলে দেওয়া হয়।
- প্রাথমিক স্তর ৬ বছর মেয়াদী, নিম্ন মাধ্যমিক ৩ বছর মেয়াদী, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ২ বছর মেয়াদী।
- মালয়েশিয়ার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ, আত্মিক, অযোগিক ও শারীরিক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাল সাধন এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্বীয় দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করা এবং নান্দনিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ।
- মালয়েশিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষা ৩টি পর্বে বিভক্ত। নিম্ন মাধ্যমিক (৩ বছর মেয়াদী), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২ বছর মেয়াদী), মাধ্যমিক স্তর পরবর্তী শিক্ষা (২ বছর মেয়াদী) দুটি ধারায় বিভক্ত। (ক) ষষ্ঠ ফরম (২ বছর মেয়াদী), (খ) ম্যাট্রিকুলেশন ধারা শিক্ষা (১-২ বছর)।

উচ্চ মাধ্যমিক ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ডিগ্রি পর্যায়ে পেশাগত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বহু সংখ্যক বেসরকারি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও কারিগরি ইনস্টিটিউট রয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের নানা ব্যবস্থা ও নীতি গৃহীত হয়েছে।

- ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রতিযোগিতামূলক শিল্প, অর্থনীতি, ইলেকট্রনিক্স, বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন টেকনোলজি (IT) বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইংল্যান্ড শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে জনগণের রক্ষণশীলতা, স্বাধীনতা ও ধর্মীয়বোধ অন্যদিকে প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটেছে। বস্তুত ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে কম বেশি ইংল্যান্ডের জাতীয় চরিত্রেরই বহি:প্রকাশ ঘটেছে।

ইংল্যান্ডের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল– কর্মমূখী ও জীবন উপযোগী জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ।

- যুবকদের জন্য শিক্ষার সার্বিক সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা উন্নতীর শীর্ষে পৌঁছার জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং তাদের যোগ্যতানুযায়ী উন্নতির শেষ বিন্দুতে পৌঁছাতে পারে।
- যুক্তরাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স ১১-১৬ বছর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে (১১ বছর বয়সে) শুরু হয়।
- শিক্ষক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ণ করেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।
- ১৪ বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে G.E.C এর Ordinary পরীক্ষা হয়।
- যুক্তরাজ্যে গ্রামার স্কুল, পাবলিক স্কুল, মর্ডান স্কুল ও বহুমুখী স্কুল রয়েছে।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধান উন্নত দেশ। ৫১টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে জানা যায়, শুরুতে ধর্মীয় নেতা, সমাজ সেবক ও গৃহিনীদের উদ্যোগে ছোট ছোট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় ১৯৪২ সালে ম্যাসচুয়েট আদালত একটি আইন পাশ করে শিক্ষাকে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করা হয়। অত:পর বিভিন্ন রাজ্যে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়ভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়, সংবিধান অনুযায়ী ফেডারেল সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের উপর ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য নিজ নিজ চাহিদানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ফলে ৫১টি অঙ্গরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী প্রসারতা দেখা যায়। যেমন–

- সকল অঙ্গরাজ্য ৬ - ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক, ফলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার অনেক বেশি।
- মাধ্যমিক স্তরের জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নরত।

যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত তিনটি ধাপ রয়েছে। যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। বাস্তবায়নে রয়েছে দু'ধরনের স্কুল– স্থানীয় ফ্রি পাবলিক স্কুল ও প্রাইভেট স্কুল।

- মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স ১২ - ১৮ বছর। সপ্তম শ্রেণি হতে শুরু করা হয় (১২ বছর)। শিক্ষা মূলত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।
- রাজ্য সরকার, আইন সভা, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি ও পুস্তক নির্বাচন করে।
- যুক্তরাষ্ট্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও সিনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় শ্রেণিতে বিভক্ত।
- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
- জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষার সংবিধান রচিত।
- শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রদীপনের সাহায্যে প্রচলিত।
- শিক্ষকের মর্যাধা সমোন্নত।
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান।
- যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত: তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত:
  ক. প্রাথমিক পর্যায় (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা)
  খ. মাধ্যমিক শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা উত্তর শিক্ষার পর্যায়)
  গ. উচ্চ শিক্ষা।
- জুনিয়র হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত।
- জুনিয়র হাই স্কুলে বিজ্ঞান, গণিত ও চারুকলা শিক্ষা দেয়া হয়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য

উন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
▪ শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে বিবেচনায় রাখা হয়।	▪ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশ:উন্নয়নের জড়ত্ব, স্থবিরতা ও অচলাবস্থা নিরসনের বিষয়াদি বিবেচিত হয়।
▪ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খুব মজবুত থাকে।	▪ জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকে।
▪ শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ মানের থাকায় মানবসম্পদ তৈরিতে শতভাগ সফলতা অর্জিত হয়।	▪ শিক্ষা ব্যবস্থার মান ক্রমবর্ধমান থাকে। মানবসম্পদ উন্নয়নে নানান পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ফলে উন্নয়ন মুখী ধ্যান ধারণা বৃদ্ধি পায়।
▪ শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে সমাজ থেকে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় ফলে নিরাপত্তার মান খুব উঁচু।	▪ শিক্ষার প্রসারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ফলে দেশের জনগণ কিছুটা নাগরিক তথা সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করে।
▪ শিক্ষা সম্পর্কিত উন্নয়নে সকল মানবীয় সম্পদকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।	▪ শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে।

উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক বিবরণ: ইংল্যান্ড ও আমেরিকা:

ক্ষেত্রসমূহ	ইংল্যান্ড (UK)	আমেরিকা (USA)
শিক্ষা ব্যবস্থা	মূলত: রক্ষণশীল চিন্তা ভাবনার আলোকে ইংল্যান্ডে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন– ধর্ম যাজকদের প্রচেষ্টায়। পরবর্তীতে	▪ সকল পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক, ধর্মীয় নেতা, সমাজ সেবক, গৃহিনীদের উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষা

	সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। ▪ ৫-১০ বছরের সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ▪ রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে সহ শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান।	প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। ▪ শিক্ষার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যের উপর অর্পিত হয়। অঙ্গরাজ্য নিজ নিজ চাহিদানুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ▪ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় বা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। ▪ শিক্ষার তিনটি ধারা– প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। ▪ ৬-১৬ বছর পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ▪ কোন কোন অঙ্গরাজ্যে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।
শিক্ষার স্তর	▪ শিক্ষাকে ৩ স্তরে ভাগ করা হয়। ▪ Elementary, Continuing and Further Education ▪ ৫-১৫ বছর সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তর। ▪ ১১-১৮ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর। ৭০% শিক্ষার্থী কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। ▪ ১৯৪৪ সালে (বাটলার আইন) দ্বারা সংস্কারমূলক শিক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।	
উচ্চ শিক্ষা	▪ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীন ও স্বায়ত্ব-শাসিত। কোর্ট (কাউন্সিল, ও সিনেট, ফেকাল্টি বোর্ড, শিক্ষক সমিতি, স্থানীয় স্কুল, পার্লামেন্ট সদস্য)। ▪ উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। তবে ব্যয় বহনের জন্য ঋণের পাশাপাশি বৃত্তি ও অনুদান সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।	▪ আমেরিকার উচ্চশিক্ষা মান সম্পন্ন তবে ব্যয় বহুল। ▪ অঙ্গরাজ্য ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। ▪ বহিরাগত শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বৃত্তি ও অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক ও অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়নের বিকল্প হচ্ছে–
   ক. অধিক জনসংখ্যা
   খ. রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সুদৃঢ় করা
   গ. উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা
   ঘ. নবতর প্রযুক্তির ব্যবহার

২. মাধ্যমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে কয়টি কৌশল নির্ধারিত করা হয়েছে–
   ক. ১০টি
   খ. ১৯টি
   গ. ১৫টি
   ঘ. ৪টি

৩. জাপানে কত শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক–
   ক. ১ম - ৫ম শ্রেণি
   খ. ১ম - ৩য় শ্রেণি
   গ. ১ম - ৮ম শ্রেণি
   ঘ. ১ম - ৯ম শ্রেণি

উত্তরমালা: ১। গ, ২। খ, ৩। ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য কী উল্লেখ করুন।
২. বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ২০১০ সালের শিক্ষানীতির আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সংস্কারের সুপারিশগুলো উল্লেখ করুন।
২. মাধ্যমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে নির্ধারিত কৌশলগুলো উল্লেখ করুন।
৩. মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৩.৪ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা: (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ) (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মালয়েশিয়া ও জাপান)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উচ্চশিক্ষা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়নের কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষার (উন্নয়নশীল দেশে) বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

ভূমিকা

দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন, পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই সর্বজনীন শিক্ষার পাশাপাশি চাই উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। সুতরাং, ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ধিত জ্ঞান লাভের জন্য উদ্দেশ্য সম্বনিত যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, সাধারণ অর্থে তাহাই– উচ্চ শিক্ষা।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পর মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে ৩ বছরের পাস (Pass) কোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছরের সম্মান ডিগ্রি প্রোগ্রামের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হয়। যে সকল শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি পাস প্রোগ্রাম থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হয় তাদের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রির মেয়াদ দুই বছর এবং সম্মান ডিগ্রিধারীদের জন্য এক বছর অধ্যয়ন করে। এর উর্ধ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসাবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত এবং সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

- মাস্টার্স, এম.ফিল বা পি.এইচডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসাবে বিবেচনার পাশাপাশি গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা বাধ্যতামূলক।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ক্রেডিট এবং ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে।

এছাড়া বিশেষায়িত শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন– কৃষি শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয় ডিগ্রির মেয়াদ হবে ৫ বছর। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ছয়টি স্কুলের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে ডিগ্রি প্রদান করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব হল দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশ্বব্যাপী চাহিদার সঙ্গতি রক্ষা করে দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও শিক্ষা কাঠোমো ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দেশে দেশে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ প্রতিটি দেশ নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে উচ্চশিক্ষার বৈশিষ্ট্য

উন্নয়নশীল দেশসমূহ

- শিক্ষার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারণা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞা বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় না।
- শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে হাল-নাগাদ, জ্ঞান ও কলা, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে এককভাবে কোন ব্যক্তির উপর না রেখে একটি বিশেষজ্ঞ টীমকে নিতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ ধরনের টীম ওয়ার্ক এখনও সুষ্ঠভাবে গড়ে না উঠায় দেশের সম্পদের ব্যবহার ও সুষ্ঠু বন্টনের ক্ষেত্রে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সীমিত জ্ঞান ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তারা উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে না। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ–
  - শিক্ষার পরিকল্পনার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকে।
  - শিক্ষার্থীদের প্রতি বিভিন্ন পর্যায়ে নমনীয় মনোভাব না থাকায়।
  - দারিদ্রতা ও অজ্ঞতা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ধারাকে দারুনভাবে বাধাগ্রস্থ করে।
- সীমিত সম্পদের কারণে বিভিন্ন সময়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় সরকার পরিবর্তনের সাথে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণ ব্যহত হয়।
  - এসএসসি পরীক্ষা শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুই বছরের কোর্স সমাপ্ত করার পর প্রশিক্ষণার্থীদের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট দেয়া হয়।
  - উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের জন্য এইচএসসি শিক্ষার পর দুই বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
  - কলেজ অব এডুকেশন শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা মাস্টার্স অব এডুকেশন (এমএড) ও পিএইচডি হওয়া আবশ্যক।
  - সেন্টার অব এডভান্সড স্টাডিজ ইন এডুকেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চতর ডিগ্রি করার জন্য প্রোগ্রাম রয়েছে।

জাপানের উচ্চশিক্ষা

সামাজিক মূল্যবোধ ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জনগণকে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া–

- জাপানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ছয়টি স্তর রয়েছে, যেমন- কেজি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।
- উচ্চ মাধ্যমিকের পর শিক্ষার্থীরা সামাধণ ও বিশেষ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে, চার বছরের অনার্স কোর্স ও দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করে।
- কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোন আছে এবং শিক্ষার্থীরা এ কোর্সের সার্টিফিকেট নিয়ে শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে সংবিধানিকভাবে জাপান দুটি নীতি নির্ধারণ করে।

প্রথমত: জাপান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মাঙ্গলাকাঙ্খী জাতি হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার মঙ্গল সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষাকে সাধারণ ও সমৃদ্ধশালী কৃষ্টির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার হতে পারে সংবিধানে তা উল্লেখ করা হয়।

জাপানের শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্ডার গার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যারয় পর্যন্ত সকল স্তরে প্রধানত: সংবিধান ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। জাপানের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পরিচিত (মাধ্যমিক, একাদশ ও দ্বাদশ)। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বিষয়ের ভিত্তিতে দুটিভাগে বিভক্ত। যথা–

- সাধারণ শিক্ষা;
- বিশেষ শিক্ষা: কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মৎস্য, চারুকলা, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা।

উচ্চশিক্ষা

জাপানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, জুনিয়র মহাবিদ্যালয়, প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের স্নাতক, দুই বছরের স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
- প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়ে প্রকৌশল, নৌ-বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

মালয়েশিয়া শিক্ষাব্যবস্থা

মালয়েশিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ দেশ। এদেশের জনসংখ্যার ৭৫% মুসলিম। মাতৃভাষা মালয় এবং এ দেশে বহুজাতি বাস করে। তাই বহুজাতিক জনগোষ্ঠির সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে মালয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন–

- বাধ্যতামূলক শিক্ষা স্তর চালুকরণ;
- বাধ্যতামূলক পেশায় উচ্চতর সম্মানী প্রদান;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
- কেবলমাত্র মেধাবীদের শিক্ষাকতা পেশা গ্রহণের সুযোগ।

মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ৪ ধাপ বিশিষ্ট। এর উর্ধ্বে রয়েছে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়, সকল বিদ্যালয়ই সরকারি।

উচ্চশিক্ষা

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মালয়েশিয়া "শিক্ষা অডিন্যান্স" এ আব্দুর রাজ্জাকের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং ১৯৬১ সালে রহমান তালিবের রির্পোটের ভিত্তিতে শিক্ষা আইন পাশ হয়। রাজ্জাক ও রহমান তালিবের রিপোর্টে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করা হয়েছে তার আলোকেই মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষার রূপরেখা প্রণীত।

- দেশের উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি, গবেষণার প্রসার, কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য জনবল তৈরি করাই মালয়েশিয়ার শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বহুসংখ্যক বেসরকারি মহাবিদ্যালয়, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬টি কারিগরি ইনস্টিটিউট আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ও বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান, কারিগরি বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে নানা ব্যবস্থা ও নীতি গৃহীত রয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা গবেষণার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে ৩০টি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে ১টি তে ইসলাম ধর্ম শিক্ষকদের এবং তার ১টি-তে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কার্যক্রম অনুসারে প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদের পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

- ১ বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন;
- ২-৩ বছরের সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন কোর্স;
- ৪ বছর মেয়াদি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত স্নাতক ডিগ্রি প্রদান।

এছাড়া সকল প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

- মালয়েশিয়ায় ৪ বছরের স্নাতক কোর্স ও ২ বছরে মাস্টার্স কোর্স প্রচলিত।

এছাড়া কিছু কিছু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীরা এ সার্টিফিকেট নিয়ে শ্রম বাজারে যায়।

মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা এক মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এক দিকে যেমন রয়েছে সরকারি সহযোগিতা তেমনি অন্যদিকে রয়েছে ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা। তাই সামান্য সময়েই মালয়েশিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ব্যাপক উন্নতি।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং ১৯৯২ সালে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে সকল বিষয় গুরুত্বারোপ করা হয় তা হলো:

- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা;
- সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা;
- নারী শিক্ষা;
- উচ্চ শিক্ষা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি।

এছাড়া প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:

- শিক্ষা কাঠামোকে তিন শ্রেণিতে বিন্যাস। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।
- ১৯৮৬ সালে শিক্ষানীতির আলোকে বারো বছরের শিক্ষা বছরকে দুই ধারায় বিন্যাস করা হয়। যা বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুসরণ করা হয়।

- নিম্ন প্রাথমিক ৫ বছর, উচ্চ প্রাথমিক ৩ বছর, নিম্ন মাধ্যমিক ২ বছর ও উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর। অর্থাৎ ৫+৩+২+২= ১২।
- উচ্চশিক্ষার মেয়াদ ৩ বছর ও পেশাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার মেয়াদ ২-৫ বছর।
- ভারতের সংবিধানুযায়ী ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ রাষ্ট্র করে যা হবে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক।

স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে ডক্টর সর্বল্লী রাধা কৃষ্ণানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। পরবর্তীকালে ভারতের উচ্চ শিক্ষার বিকাশে এই কমিশনের রিপোর্টের অবদান অপরিসীম।

সাধারণত: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজগুলোতে কলা, বিজ্ঞান, পেশা ও শিক্ষণধর্মী কলেজ, বিশেষ শিক্ষার কলেজ, যেমন– সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের প্রতিষ্ঠানসমূহে:

- রাজ্যের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়;
- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;
- কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন– বেনারস, আলিগড়, দিল্লি বিশ্বভারতী, জওহরলাল নেহেরু, হায়দ্রাবাদ, মর্দান হল।
- জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন– ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, অল-ইন্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব মেডিকাল সায়েন্স, পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিচার্স এন্ড একুকেশাল চন্দ্রিগড়।
- উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমতুল্য প্রতিষ্ঠান; জামিয়া মিল্লিয়া, ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স (বাংগালোর)।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য কথিপয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন– বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, (UGC) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন (NIEPA), ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (NCERT), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সার্ভিস রিসার্চ (ICSR), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকল রিসার্চ (ICHR), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলোসফি (ICP), অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব এগরিকালচারাল রিসার্চ (ICAR), ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এডভান্সড স্টাডিজ (IIAS)।

উচ্চশিক্ষার প্রসার

অংশগ্রহণের দিক দিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার পরের স্থান ভারতের। সামাজিক ও অগ্রসরজ ও অর্থনৈতিকভাবে আধুনিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা মানুষের মনে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। যদি ও উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারনের ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মানব সম্পদ তৈরি ও কর্মসংস্থানে অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে।

অর্থায়নে, কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদালয়ের অর্থায়নের উৎস কেন্দ্রিয় সরকার। স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন হয় রাজ্য সরকারের অধীনে। সিনেট সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল হল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান কর্তৃপক্ষ। সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষরূপে সিন্ডিকেল প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন, প্রশাসন কাজ সম্পাদন করে। পরীক্ষা নীতি, শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সিন্ডিকেট গ্রহণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হলো একাডেমিক কাউন্সিল। শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, নতুন কোর্স প্রর্বতন, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষকদের যোগ্যতা, গবেষণা কার্যক্রম ইত্যাদি সকল বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিল আলোচনা করেও সুপারিশ গ্রহণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন– চ্যান্সেলর। তিনি আইন অনুসারে তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা হলেন, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্টার/রেক্টর, অনুষদের ডিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও গ্রন্থগারিক।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষণার মান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খ্যাতমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। তাই ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম রয়েছে।

উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষা

যে কোন দেশের চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ধাপ হলো সে দেশের উচ্চশিক্ষা। উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষার গণ্ডি নিজ দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার মূল্যায়নে উন্নত দেশের শিক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক ও বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করা হয়। ফলে এর প্রভাব দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা স্বদেশের উচ্চ শিক্ষাকে আধুনিক বিশ্বের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নত শিক্ষার নিদের্শনা পাওয়া যায়।

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্নত বিশ্বের কয়েকটি দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের প্রধান উন্নত দেশ। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বিদ্যমান। যার ফলে চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২০০০ উচ্চ শিক্ষাক্রম পরিচালনা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। জ্ঞানার্জন, বিষয় ভিত্তিক শিক্ষাদান, ডিগ্রি প্রদান, কর্মসূচি শিক্ষার গবেষণা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অঙ্গরাজ্য সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থায়নের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখে।

যুররাষ্ট্র মূলত ৫১টি রাজ্য নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন রাজ্যের শুরুতে ধর্মীয় নেতা, সমাজ সেবক ও গৃহিনীদের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বা জাতীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। সংবিধান অনুযায়ী যখন ফেডারেল সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন হয় তখন শিক্ষার দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যের উপর অর্পিত হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমেরিকার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে "ম্যাসাচুসেট আইন" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ সংবিধানিক আওতায় নিজস্ব শিক্ষাক্রম তৈরি এবং স্কুলের মান ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, ফলে ৫১টি অঙ্গরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী প্রসারতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্টের শিক্ষার কথিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন–

- সকল অঙ্গরাজ্যে ৬-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক;
- আবার কোন কোন অঙ্গরাজ্যে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

ফলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা অনেক বেশি। মোট জনসংখ্যার (মাধ্যমিক স্তরের) প্রায় ৯০% মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নরত। Economic Act of 1964 ও Elementary and Secondary Education Act of 1965 আইনের ফলে অধিক হারে স্কুল পরিত্যাগ (Drop Out) হ্রাস পায়। এ নতুন আইন কার্যকরী করার ফলে যে সকল ছেলে-মেয়েরা সাধারণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সম্ভব ছিল না তারা স্ট্রিট একাডেমীতে মাধ্যমিক শিক্ষা গৃহণের সুযোগ লাভ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার কাঠামো

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি ধাপ বিদ্যমান; যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। শিক্ষা বাস্তবায়নের দু'ধরনের স্কুল বিদ্যমান, যেমন– স্থানীয় ফ্রি পাবলিক স্কুল ও প্রাইভেট স্কুল। তবে প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশই পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া করে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় আমেরিকার শিক্ষার স্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্যার্টান প্রচলিত আছে। কোন অঙ্গরাজ্য বা কোন স্কুল কোন নমুনা বা প্যার্টান গ্রহণ করবে তা একান্তভাবে জনগণের বিশ্বাস, চাহিদা ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পেশাগত ও কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আমাদের দেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে আমেরিকায় সিনিয়র হাই স্কুল বলা হয়, যা মূলত: মাধ্যমিক পর্যায় অন্তর্ভুক্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করে। স্নাতক পরবর্তী ১ বছরের, স্নাতকোত্তর কোর্স রয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ডক্টরেট ডিগ্রি রয়েছে এবং এ পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিদ্যমান। স্নাতক কোর্সের পর ৩/৪ বছর মেয়াদী পি.এইচডি করার সুযোগ রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা (UK. Edu. System)

আমরা জানি, ইংরেজ জাতির সভ্যতার ইতিহাস ঐতিহ্যমন্ডিত ও সুশৃঙ্খলিত। যুক্তরাজ্যে শিক্ষা শুরু হয় ধর্ম যাজকদের প্রচেষ্টায়। পরবর্তীতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসহ সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করে।

ইংল্যান্ডের বর্তমান শিক্ষা আইনে ৫-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সকল স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক স্কুলে ইংল্যান্ডের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায় ৭০% ভাগ ছাত্র-ছাত্রী কাউন্টি কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ১১-১৮ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। কাউন্টি কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস করা হয়। কিছু সংখ্যক কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ১১-১৮ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। মিডল স্কুল থেকে আবার শিক্ষার্থীরা কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে প্রবেশ করতে পারে। কোন কোন কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে এবং ১৬ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অবশিষ্ট ছেলে-মেয়েরা ফলাফলের ভিত্তিতে মর্ডান গ্রামার স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়। শিক্ষা আইন দ্বারা টেকনিক্যাল স্কুলগুলোকে মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা দেওয়া হয়।

উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কোন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয় না। ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স পাশ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য সার্বিক দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা দেশ হিসেবে পরিচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশ্ব রাজনীতি, প্রকৃতি সব দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। পক্ষান্তরে রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে যুক্তরাজ্যে শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষা পরিচালনা করা হয়।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কলেজ, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফার্দার কলেজ যথারীতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রায় ৯০+টি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার কাজে নিয়োজিত। একাডেমিক কার্য-পরিচালনায় এগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। একাডেমিক প্রোগ্রাম প্রণয়ন, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি, ডিগ্রি প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন। তের শতকে সর্বপ্রথম অক্সফোর্ড (Oxford) ও কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এডিনবার্গ (Ediuburg) বিশ্ববিদ্যালয় ষোল শতকে স্থাপিত হয়। অবশিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয় ঊনিশ ও বিশ শতকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ষাটের দশকে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়ছে। ১৯৯২ সালে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ও উচ্চশিক্ষার কলেজগুলোতে কিছু নীতির ভিত্তিতে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়।

ফার্দার এডুকেশনের আওতায় অসংখ্য কলেজ ও প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ব্রিটিশ জাতির প্রয়োজনে নানা ধরনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের কার্যকাল, সাধারণত ৩ বছরের,

- কোথাও কোথাও চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রচলিত;
- মেডিক্যাল ও পশু চিকিৎসার কোর্স ৫ বছরের।

সাধারণত: বহি:পরীক্ষক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়।

উচ্চতর প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক প্রয়োগের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের সমন্বয়ে ৫০টির বেশি বিজ্ঞান পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭১ সালে। স্নাতক, মাস্টার্স ও উচ্চ পেশাগত ডিগ্রির জন্য বিভিন্ন ধরনের কোর্স এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। ব্রিটেনসহ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জিব্রালটার, স্লোভেনিয়া, সুইজারল্যান্ড থেকে অনেকে বয়স্ক শিক্ষার্থী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। যুক্তরাজ্যের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের পাশাপাশি একটি মডেল হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান কর্তৃপক্ষ হলো কোর্ট, কাউন্সিল, সিনেট ও ফেকাল্টি বোর্ড। তবে কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্টাফ, স্থানীয় স্কুল, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সমিতি ও পার্লামেন্টের সদস্য প্রভৃতি নিয়ে কয়েকশত সদস্য নিয়ে কোর্ট গঠিত হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের রিপোর্ট শোনা, কাউন্সিল সদস্য নিয়োগ এবং কাউন্সিলের সুপারিশ অনুমোদন করা এই কোর্টের প্রধান কাজ।

যুক্তরাজ্যের উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। তবে শতকরা ৯৫% শিক্ষার্থী স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আর্থিক সহায়তায় লাভ করে। শিক্ষার ব্যয় ভার বহনের জন্য ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা বিভাগ, গবেষণা কাউন্সিল, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দাবত্য সংস্থা বৃত্তি ও অনুদান প্রদান করে।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বিভাগ ও নানা বেসরকারি সংস্থা থেকে বৃত্তি ও অনুদান প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। যেমন– ব্রিটিশ কাউন্সিল, কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, ফেলোশিপ প্ল্যান, ফুল ব্রাইট, ব্রিটিশ মার্শাল, রোডস, চার্চিল এবং কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাষ্ট্রিস স্কলারশিপ অন্যতম।

তুলনামূলক শিক্ষা: জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত ও বাংলাদেশ

ক্ষেত্রসমূহ	জাপান	মালয়েশিয়া	ভারত	বাংলাদেশ
শিক্ষাব্যবস্থা	**৪ ধাপ বিশিষ্ট:** কেজি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা।	**৪ ধাপ:** সকল পাবলিক বিদ্যালয় (Auto Promotion)।	**৩ ধাপ:** প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা।	**৩ ধাপ:** প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক।
প্রাক-প্রাথমিক	(৩-৫) বছর= নার্সারী + K.G	সরকারি + বেসরকারি K.G (২ বছর)।	বেসরকারি ভাবে পরিচালিত।	সরকারি + বেসরকারি, K.G (১ বছর)।
প্রাথমিক শিক্ষা	গ্রেড– (১-৯ম) বাধ্যতামূলক ৬ বছর মেয়াদি।	অবৈতনিক তবে বাধ্যতামূলক নয়। ৬ বছর মেয়াদি। ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক।	১১ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক, সর্বজনীন + বাধ্যতামূলক, (৫+৩) বছর মেয়াদি।	অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। (৫ বছর) J.S (৩ বছর)।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	৩ বছর + ৩ বছর = ৬ বছর। (৬+৩+৩= ১২ বছর)।	L. S (৩ বছর) মাধ্যমিক (২ বছর) + উচ্চ মাধ্যমিক (২ বছর), P.S (২ বছর), প্রাথমিক (১ বছর) (৩+২+২+ ২+১= ১০ বছর)	(৫+৩)= ৮ বছর প্রাথমিক, মাও.উ.মা. = (২+২) বছর। (৫+৩+২+২)= ১২ বছর।	প্রাথমিক ৫ বছর, J.S (৩ বছর), মাধ্যমিক (২ বছর), উচ্চ মাধ্যমিক (২ বছর) (৫+৩+২+২) = ১২ বছর।
উচ্চশিক্ষা	৪ বছর মেয়াদি (স্নাতক) ২ বছর মেয়াদি (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি বিভিন্ন কোর্স।	৪ বছর মেয়াদি (স্নাতক) ২ বছর মেয়াদি (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স	৩ বছর মেয়াদি (স্নাতক) ২ বছর মেয়াদি (স্নাতকোত্তর) এম.ফিল, পি.এইচডি	৪ বছর মেয়াদি (স্নাতক) ২ বছর মেয়াদি (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি অন্যান্য কোর্স।
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১ বছর মেয়াদি শিক্ষাগত সনদ + চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়।	চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ + সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।	এসএসসি পরবর্তী ২ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা, এইচএসসি পরবর্তী, ২ বছর মেয়াদি বিএড, এমএড, পি.এইচপি কোর্স।	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য বিএড ও এমএড ডিগ্রি বাধ্যতামূলক। এছাড়া চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।
মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	Auto- Promotion	ধারাবাহিক মূল্যায়ন: ▪ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন টেস্ট। ▪ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ।	আন্ত: + বহি: পরীক্ষা = মূল্যায়ন	J.S.C + J.S.C + S.S.C + H.S.C পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উচ্চশিক্ষা কী?
ক. আচরণগত উন্নীত শিক্ষা
খ. উদ্দেশ্য সম্বলিত শিক্ষা
গ. সর্বজনীন শিক্ষা
ঘ. সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করা

২. দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমের সংগতি বিধান করে–
ক. শিক্ষা মন্ত্রী/মন্ত্রণালয়
খ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশন
গ. স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
ঘ. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩. শিক্ষার উন্নয়নে জাপান কর্তৃক কয়টি নীতি নির্ধারণ করেছে–
ক. ৪টি
খ. ৩টি
গ. ৫টি
ঘ. ২টি

৪. মালয়েশিয়ার "শিক্ষা অডিন্যান্স আইন" রূপরেখা কত সালে পাশ হয়–
ক. ১৯৫১ সালে
খ. ১৯৫৭ সালে
গ. ১৯৬১ সালে
ঘ. ১৯৮০ সালে

৫. ভারতের শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়–
ক. ১৯৫৫ সালে
খ. ১৯৪৭ সালে
গ. ১৯৭০ সালে
ঘ. ১৯৪৮ সালে

৬. বিশ্বের প্রধান উন্নত দেশ–
ক. রাশিয়া
খ. আমেরিকা
গ. যুক্তরাজ্য
ঘ. সৌদি আরব

৭. ইংল্যান্ডে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়–
   ক. ১৯০৩ সালে
   খ. ১৯৭১ সালে
   গ. ১৯৬৯ সালে
   ঘ. ১৯৫০ সালে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. খ, ৬. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়নের কৌশলগুলো কী কী?
২. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজ কী?
৩. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বোঝায়?
৪. জাপানের উচ্চশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?
৫. ইংল্যান্ডে শিক্ষা শুরুতে কাদের অবদান রয়েছে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশসমূহে উচ্চশিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বারোপ করা হয়, উল্লেখ করুন।
৩. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার তুলনামূলক বর্ণনা দিন।
৪. জাপান, ভারত, মালেশিয়া ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক বিবরণ দিন।

পাঠ ৩.৫ বয়স্ক শিক্ষা: Adult Education (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বয়স্ক বলতে কী ও কেন তা বলতে পারবেন।
- বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- বয়স্ক শিক্ষার সম্পন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের (আমেরিকা) বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্ব স্ব জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে সকল নাগরিকবৃন্দকে সুশিক্ষিত এবং প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বয়স্ক জনগোষ্ঠি বিদ্যমান থাকায় জাতীয় উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তৎপরতা রয়েছে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরে অনির্ধারিত বয়সসীমার মাঝে অনানুষ্ঠানিকভাবে এবং সার্বজনীনভাবে বয়স্কদের জন্য যে শিক্ষাধারা প্রবর্তন করা হয় তাকেই "বয়স্ক শিক্ষা" বা Adult Education বলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত বয়সসীমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত ব্যক্তি বর্গের জন্য অনানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষার ধারার প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী, অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় গমন বিমুখ বয়স উত্তীর্ণদের পরবর্তীতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মমর্যাদা এবং আত্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করে। বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে– নবতর উদ্ভাবন, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যা ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামাজিক কর্মকান্ডে অবদান রাখার যোগ্য করে গড়ে তুলে।

বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- আত্মউপলব্ধি বৃদ্ধি ও আত্মসচেতনতা জাগ্রতকরণ;
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- স্বাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি;
- সৃষ্টিশীল ও নান্দনিক প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মৌলিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সম্প্রসারণ;
- নেতৃত্বদানের গুণাবলির বিকাশ সাধন করা;
- সামাজিকভাবে মূল্যবোধ দৃঢ়করণে সহায়ক;
- শারীরিক ও আবেগিক বৈশিষ্ট্যাবলি সমৃদ্ধকরণ;
- পেশাগত চিন্তা শক্তির বিকাশে সহায়ক।

বয়স্ক শিক্ষার সম্পন্ন প্রক্রিয়া

- নির্ধারিত শিক্ষণ-শিখন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সুদক্ষ প্রশিক্ষক যোগান;
- শিখন চক্রের আবর্তন;
- শিখনে আধুনিক ও আকর্ষণীয় শিখন-সামগ্রী ব্যবহার;
- ফলাবর্তনের প্রবর্তন;
- পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;
- উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা;
- অব্যাহত শিক্ষার সম্প্রসারণ।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষার যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে তা হলো–

- গণশিক্ষা কর্মসূচি (১১–৪৫ বছর বয়স);
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- বৃত্তিমূলক কার্যক্রম;
- কর্মকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
- অবিরত পেশাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ;
- ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সেন্টার;
- গ্রামীণ সমাজ সেবা উন্নয়ন।

স্বায়ত্ব শাসিত পর্যায়ে

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা, কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, যেমন– সাম্য উৎপাদন ঋণ, কৃষি দ্রব্য বাজারজাতকরণ, কুটির শিল্প, সমাজে নারীর অবস্থান, নিরক্ষরতা ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামের মাতব্বর, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ, চাষী, শিক্ষক, গ্রাম ডাক্তার, ধর্মীয় নেতা ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে নিজ নিজ পেশার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- এছাড়া রাস্তাঘাট উন্নয়ন, গ্রাম ভিত্তিক সমবায়, নারী শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা উন্নয়ন, ভেন্ডার, যুব উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মাছ চাষ, বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করে।

বেসরকারি পর্যায়ে

- পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করে বহুল ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। এছাড়া গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৯৭২ সাল থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের প্যারমেডিক্যাল প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের সেলাই ও তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প, ধাতুর কাজ এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- আহছানিয়া মিশন ১৯৮৫ সাল থেকে সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা ইনস্টিটিউট প্রতি বছর অসংখ্য কর্মীকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক শিক্ষা

যে কোন রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অবদানের উপর। তাই শিক্ষাই একমাত্র মানুষের সুপ্ত ও সহজাত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে ব্যক্তি জীবনে সুখ সাচ্ছন্দ্য ও সফলতা নিয়ে আসে, সমষ্ঠিগতভাবে গৃহীত কর্মকান্ডে অবদান রাখতে ব্যক্তিকে উদুদ্ধ করে।

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য; দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাক্ষরতার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষাকে মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনায় রেখেছে। উন্নত দেশসমূহে প্রাতিষ্ঠান শিক্ষা বহির্ভুত শিক্ষাকে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করছে।

উন্নত দেশ (আমেরিকা)-এর বয়স্ক শিক্ষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ সেখানে নিরক্ষর থাকার কোন সুযোগ নেই। শিক্ষার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল শিশুকে অধ্যয়ন করতে হয়। বিদ্যালয় পাঠ ছেড়ে যদি কেহ পেশা গ্রহণ করে তাতে রাষ্ট্রের কোন আপত্তি নেই। কারণ উচ্চ শিক্ষার অবারিত সুযোগ রয়েছে। কাজেই বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় আমেরিকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একক ও অভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা চালুর তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বয়স্কদের জন্য প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকেই যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক শিক্ষা বা Adult Education বলে। এ সকল শিক্ষা সাধারণত যে সকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলো হলো–

- সরকারি প্রতিষ্ঠান;
- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিষ্ঠার;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষা;
- সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান;
- মালিক পক্ষ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান;
- শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালিত প্রতিষ্ঠান;
- সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক শিক্ষা বলতে মূলত বয়স্কদের কারিগরি, পেশাগত ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান যা খণ্ডকালীন শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্করা অর্জন করে।

১৯৬০ সাল থেকে মূলত বয়স্ক শিক্ষার ঐতিহাসিক পরিবর্তন আসে। যদিও ইতিপূর্বে বয়স্ক শিক্ষা প্রধানত স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ হিসেবে প্রচলিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত কিছু পেশাজীবির প্রচেষ্টায় বয়স্ক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে এবং ইংল্যান্ডের বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু করে। পরবর্তীতে National University Extension Association, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সদস্য নিয়ে বয়স্ক শিক্ষাক্রম চালু করে যা বয়স্কদের পেশাগত যোগ্যতা, জীবিকার সম্ভাবনা ও আর ক্ষমতা বাড়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৯৩২ সালে কলম্বিয়া টিচার্স কলেজে সর্বপ্রথম বয়স্ক শিক্ষায় স্নাতক প্রোগ্রাম চালু করে। Higher Education Act বয়স্কদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ শিক্ষা গ্রহণ সুবিধাজনক করে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে বয়স্কদের চাহিদানুযায়ী স্থাপন করা হয়েছে কমিউনিটি কলেজ। যেখানে বিভিন্ন বিষয় এবং ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের আধিক্য ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছোট শহরের তুলনায় বড় শহরগুলোতে

কমিউনিটি বয়স্ক শিক্ষা বেশি ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়। এতে বয়স্কদের কলেজ ছাত্র হিসেবে ফিরে আসার দ্বিতীয় সুযোগ প্রদানে উৎসাহিত করা হয়। সেখানে তারা দু'বছরের কারিগরি ডিগ্রি ও অবসরকালীন কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটি সার্ভিসের কাজ সম্বন্ধে ধারণা ও দক্ষতা আয়ত্ব করতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা চিত্তকর্ষক ও বহুল প্রচলিত ধরন হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ সার্ভিস। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের উপর ভিত্তি করে ফেডারেল স্টেট ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সেবার মূল উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ সংগঠন, খামার ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যা ও কাজে এই সেবা সাহায্য করে থাকে।

শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষার পাশাপাশি ১৯৯০ সালে বেসরকারি উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষা এক নীরব বিপ্লব ঘটায় যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারায় প্রায় সমান পরিলক্ষিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত এ ধরনের বয়স্ক শিক্ষাকে এখন Human Resource Development (HRD) বা জনসম্পদ উন্নয়ন বলা হয় যা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাধান্য বিস্তার কর আছে।

যুক্তরাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা

যুক্তরাজ্যের বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাসে দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথতম বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সুবিধা। দ্বিতীয়ত সরকার কর্তৃক সমর্থিত স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষার সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রথমটির অর্ন্তগত হচ্ছে Chruch Trade Union, Co-operative movement, Chrtists, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভলান্টারী সোসাইটি থেকেই বয়স্ক শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হয়। ব্যক্তির বৃত্তিমূলক দক্ষতার উন্নয়নের চেয়ে ব্যক্তির সাধারণ শিক্ষার অবস্থার উন্নয়ন করে সমাজের উন্নতির সাধনই এর মূল লক্ষ্য ছিল। অন্য প্রথাটি বয়স্কশিক্ষার উপযোগী এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫০-১৮৯০ কাল পর্বে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ থেকে এই প্রথাটির সৃষ্টি। শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের চাহিদার সাথে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৯ এর ১৮৯৮ সালে Technical Instruction Act-এ বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য বৈকালিক স্কুল এবং কারিগরি ও দক্ষতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। এভাবে বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নের ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৫ সাল থেকে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৬০ এর শেষ দিকে ও ১৯৭০ এর প্রথমে বেশ কিছু Community Development Scheme, Action Research এবং Demonstration শুরু করা হয়। বস্তুত ১৯৭৫ এর পূর্বে যুক্তরাজ্যে খুব কম বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালে মৌলিক শিক্ষা উত্তর বয়স্ক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৮-৮০ সালের পর Adult Literacy and Basic Skills Unit বয়স্ক শিক্ষার ধারণাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে এবং উন্নতির চালিকা শক্তি হবে ব্রিটিশ কর্মশক্তির দক্ষতার উন্নয়ন এবং অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বাড়ানোর চাহিদা পূরন।

ভারতের বয়স্ক শিক্ষাঃ (১৯৪৭-৭৭)

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বয়স্ক সাক্ষরতার শিক্ষায় বেশ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৪৭-৭৭ সাল পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার বিকল্পকে তিনটি পৃথক আন্তঃসম্পর্কিত পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বয়স্ক শিক্ষার নীতিমালা এবং প্রোগ্রামগুলো রাষ্ট্রের উন্নয়ন কৌশলের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে উন্নয়ন কৌশলে পরিবর্তন আসে এবং নতুন উন্নয়ন কৌশল হিসেবে গ্রামীণ উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এতে বয়স্ক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্য প্রাধান্য লাভ করে।

১৯৭৮ সালে তরুণ বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য National Adult Education Programme (NAEP) নামে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা প্রোগ্রাম প্রর্বতন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল:

- ব্যবহারিক দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক ক্ষমতার উন্নয়ন সাধন।
- দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা, সুবিধা বঞ্চিত অবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারের বিভিন্ন আইন ও নীতি সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি করা।

সাম্প্রতিককালে ভারতের বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়–

- আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত বয়স্ক শিক্ষা।
- উন্নয়নের জন্য বয়স্ক শিক্ষা।

১৯৬৪ সালে ভারতীয় শিক্ষানীতিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। তবে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বয়স্ক নিরক্ষরদের মৌলিক শিক্ষা দেয়ার জন্য বয়স্ক শিক্ষায় জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে National Literacy Mission প্রতিষ্ঠা করে কর্মক্ষতম জনসংখ্যার নিরক্ষরতা দূরীকরণের কৌশল হিসেবে Total Literacy Campaigus (TLCs)-এর প্রর্বতন করা হয়। নির্দিষ্ট এলাকা, নির্ধারিত সময় স্বেচ্ছাসেবী নির্ভর ভিত্তিক প্রোগ্রাম হিসেবে TLCs-এর পরিকল্পনা করা হয়। নিম্ন পর্যায়ের স্বাক্ষরতা সম্পন্ন মহিলা এবং অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত গ্রুপকে দ্রুত স্বারক্ষতা শিখনে বিশেষ ধরনের TLCs ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান UNICEF-এর সহায়তায় বয়স্ক মহিলা ও মেয়েদের সাক্ষরতা ভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়।

দেশের জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদির উপরভিত্তি করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে গৃহীত হয়ে থাকে। শিক্ষা কার্যক্রমগুলোর অর্ন্তভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে–

- স্বাক্ষরতা ও বুনিয়াদী শিক্ষা;
- কর্মমুখী, বৃত্তিমূলক ও স্বকর্মসংস্থানমূলক কারিগরি শিক্ষা;
- ভাষা, হিসাব নিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা;
- পেশাগত উন্নয়নমূলক শিক্ষা;
- স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতামূলক শিক্ষা;
- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিকরণ, সামাজিক ও পারিবারিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারীদের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে, নবতর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে ব্যক্তিকে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার যোগ্য করে গড়ে তোলা।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যক্রমসমূহ–

গণশিক্ষা কর্মসূচি: সরকারি পর্যায়ে ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে গণশিক্ষা কমূসূচি গৃহীত এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডের উপর বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

কর্মকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (NAEM) বেসরকারি ও সরকারি কলেজসমূহের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর কর্মকালীন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। এ ছাড়া ৫টি বিভাগীয় শহরে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটগুলো (HSTTI) প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করছে।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রশাসক, সরকারি কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের শিক্ষকবৃন্দকে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রকল্প

সমাজ কল্যাণ বিভাগের একটি অংশ। গ্রামীণ সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বেকার যুবক, ভূমিহীন কৃষক ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহায়তা করা এদের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে শিশু স্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উৎসাহিত করা একটি অন্যতম কর্মসূচি।

মাদার্স ক্লাবঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্লাব মহিলাদের অবসর বিনোদনের পাশাপাশি মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা ও সহায়তার যোগন দিচ্ছে এবং সমাজে জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সম্পর্কে ধারণা ও সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করছে। এছাড়া এসব ক্লাব তরুণী ও মহিলাদের জনসংখ্যা শিক্ষাদানে ভূমিকা রাখছে।

ম্যানেজম্যান্ট ডেভেলাপমেন্ট সেন্টারঃ শিল্প মন্ত্রণালয় এর অধীনে এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

স্বায়ত্বশাসিত পর্যায়েঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ১৯৬০ সালে কুমিল্লা কোতোয়ালী থানাকে নিয়ে কাজ শুরু করে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন–

- জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে, কৃষি, পশুপালন, স্বাস্থ্য, মৎস্য ও শিক্ষার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামের মাতব্বর, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, চাষী, শিক্ষক, গ্রাম ডাক্তার, ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিজ নিজ পেশার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচির উপর গবেষণা ও সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নের গৃহীত এই "সমবায় মডেল" সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করে এবং বাংলাদেশের সকল থানায় তা সম্প্রসারণ করেছে।

বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম

পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষার কেন্দ্রঃ পল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পদ্ধতি ও কৌশল সংগ্রহ করে তা উন্নয়ন ও আধুনিককায়ন করে তা ব্যবহারের উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি এগুলো প্রকাশনার মাধ্যমে প্রচার করে আসছে।

গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ ১৯৭২ সাল থেকে এই কেন্দ্র স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয় এবং প্যারামেডিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান, মহিলাদের সেলাই ও তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্পের কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

আহছানিয়া মিশনঃ এই মিশন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করছে। ১৯৮৫ সাল থেকে এই মিশন সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক সাক্ষরতা কর্মীকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এছাড়া বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি, ব্রাক, গ্রামীণ ব্যাংক, জাগরণী, প্রশিকা, ইউসেফ ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

বাউবিঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বয়স্ক ও পেশাজীবিদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বাউবি দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বয়স্ক ও পেশাজীবিদের শিক্ষায় অবদান রেখে আসছে। প্রোগ্রামের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারনের পাশাপাশি বয়স্ক পেশাজীবিদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সৃষ্টি করে আসছে। যেমন–

- সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিএড);
- ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড);
- মাস্টার অব এডুকেশন (এমএড);
- ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচারাল এডুকেশন (বিএগএড);
- সার্টিফিকেট-ইন-ম্যানেজমেন্ট (জিডিএম);
- মাস্টার অব বিজনেস এডমিনিসট্রেশন (এমবিএ);
- ব্যাচেলর-ইন-ইংলিশ ল্যাগুয়েজ টিচিং (বেল্ট);
- ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সাইন্স এন্ড এ্যাপ্লিকেশন (ডিসিএসএ)।

আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম ছাড়াও বয়স্ক ও পেশাজীবীদের জন্য বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম জনগোষ্ঠির চাহিদার প্রয়োজনে পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন– বেসিক সাইন্স, কৃষি মৎস্য চাষ, বনায়ন, ফল ও উদ্যানবিদ্যা, পশু ও হাঁস মুরগী পালন, ব্যাংক ঋণ, খাদ্য তৈরি, সংরক্ষণ, জনসংখ্যা শিক্ষা, পরিবেশ বিদ্যা, মাতৃত্ব ও শিশুর যত্ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি।

Coles Edwin Towusend; Adult Education in Developing Countries-এ উল্লেখ করেন, বয়স্ক শিক্ষার মূল বিষয়গুলো হলো–

সাধারণ শিক্ষাঃ যার মূলভিত্তি হবে সাক্ষরতা ও হিসাব নিকাশ এবং এর মূল উপাদান হবে ভাষা, হিসাব দক্ষতা, দৈনন্দিন জীবনমুখী দক্ষতা ও পৌর ও সামাজিক জ্ঞান।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণঃ চাহিদা মত সকল বৃত্তিমূলক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

পৌর ও সামাজিক শিক্ষাঃ পৌর শিক্ষা, পরিবার-বিষয়ক শিক্ষা ভূমিকা শিক্ষা ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, গোষ্ঠী উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত অনুরাগ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বয়স্ক শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে, সাক্ষরতা, মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিকতা শিক্ষা, বহুমুখী, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, স্বকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা, ভাষা, হিসাব নিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

UNESCO (১৯৭৬)-এ রিপোর্ট অনুযায়ী বয়স্ক শিক্ষার অর্ন্তগত হবে–

"All forms of education experience needed by men and women according to their varying interests and requirements, at their differing levels of comprehension and ability and in their changing role and responsibilities throughout life."

সুতরাং বয়স্ক শিক্ষা এমন এক শিক্ষা যা ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দেবে ফলে পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডার তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় উন্নয়নে সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা অপরিহার্য। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে স্বাক্ষর করে তোলা যায়। যার ফলে তাদের মধ্যে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়ে উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে সামর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বয়স্ক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
   ক. কেবল মাত্র বয়স্কদের জন্য শিক্ষা
   খ. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা
   গ. অনির্ধারিত বয়স সীমার শিক্ষা

২. ভারতের বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থাকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়–
   ক. তিন ভাগে
   খ. দুই ভাগে
   গ. চার ভাগে

৩. উন্নয়নশীল দেশসমূহে বয়স্ক শিক্ষার মূল বিষয়গুলো–
   ক. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
   খ. বৃত্তিমূলক শিক্ষা
   গ. সামাজিক শিক্ষা

৪. জাতীয় উন্নয়নে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন–
   ক. বৃত্তিমূলক শিক্ষা
   খ. প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা
   গ. বয়স্ক শিক্ষা

উত্তরমালা: ১। গ, ২। খ, ৩। উপরের সবকটি, ৪। গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

২. বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়বস্তুগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা দিন।

২. বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩.৬ উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা
Open and Distance Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উন্মুক্ত শিখনের কাঙ্খিত লক্ষ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- উন্মুক্ত শিখনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- দূর শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দূর শিক্ষার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- দূর শিক্ষা ও উন্মুক্ত শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য, বলতে পারবেন।

ভূমিকা

বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক ভাবনাগুলোর সাথে শিক্ষার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। জাতীর উন্নয়নের সব বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার বিনিয়োগে ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শিক্ষার বিভিন্ন ধারণা ও কার্যক্রম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। শিক্ষা লাভ প্রতিটি ব্যক্তির একটি মৌলিক অধিকার। তাছাড়া শিক্ষা হচ্ছে জীবনভর চলমান একটি প্রক্রিয়া যা জীবনকে সমৃদ্ধ ও মহীয়ান করে তোলে। শিক্ষা হচ্ছে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার। এতসব স্বীকৃত তত্ত্ব কথার পর ও শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হতে পারেনি। নানান কারণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংকীর্ণ ও কাঠামো ও অনেকাংশে দায়ী। উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাকে সকল মানুষের অর্জনযোগ্য করার লক্ষ্যে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর নমনীয় করার সুযোগ করে দিয়েছে।

দূর শিক্ষা

দূর শিক্ষা সাম্প্রতিক কালের একটি শিখন প্রক্রিয়া। এই শিখনে শিক্ষার্থী শিক্ষক হতে অনেক দূরে অবস্থান করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে। অতএব দূর শিক্ষা এক ধরনের শিক্ষাদান কৌশল যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক থেকে বহুদূরে অবস্থান করে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ শিক্ষায় দুটি মৌলিক উপাদান রয়েছে:

- শিক্ষার্থী শিক্ষক থেকে বহু দূরে অবস্থান;
- দূর শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা প্রচলিত শিক্ষাদান থেকে ভিন্নতর হয়।

এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরামর্শদানে টিউটোরিয়াল ক্লাসে স্বল্প সময়ের জন্য মুখোমুখী হন। এ শিক্ষাব্যবস্থায় মুদ্রীত শিখন সামগ্রীর উপর শিক্ষার্থীকে বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। তবে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে শিখনকে আংশিক সহায়তা করা হয়। দূর শিখনের এ নমনীয়তার জন্য সময়, দূরত্ব, বয়স, লিঙ্গ, জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ও সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতিবন্ধকতায় দূরকরণে সহায়ক হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকাসহ ৯৫টি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নানা দৃষ্টিকোন থেকে এ দূর শিখন-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ক. দূর শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষক থেকে বহু দূরে অবস্থান করে শিক্ষাদান কার্যক্রমে আধুনিক যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পৃক্ত হয়ে শিক্ষা অর্জন করে। [Distance Education is the teaching tearing process where students are separated from the teachers physically and the distance is often communicate by the modern techniques and media.]

খ. দূর শিক্ষা একটি বিশেষ পদ্ধতি যা একটি বিশেষ লক্ষ্য দলের জন্য উদ্ভাবিত। যাতে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে শিখনের সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক ও কোর্স রচয়িতাগণের ভূমিকা সহজে দৃশ্যমান হয় না। [Distance education is used as a generic term to comprise all patterns of student centered learning process in which the teacher has only a limited visible value.]

গ. দূর শিখন এক ধরনের শিক্ষন পদ্ধতি যাতে শিক্ষক কর্তৃক পূর্বের রেকডকৃত শিখন সামগ্রী ও শিখন প্যাকেজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্ব-শিখন কাজে সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পেয়ে থাকে। [Distance education is learning, at a distance from one's teachers, usually guided by teachers pre-recorded and packaged learning materials.]

উন্মুক্ত শিখন: উন্মুক্ত শিখন হল প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত শিক্ষা গ্রহণের একটি পদ্ধতি।

- উন্মুক্ত শিখন হল একটি দর্শন ও শিক্ষা শেখানের পদ্ধতির সমন্বিত শিখন ব্যবস্থা।
- উন্মুক্ত শিখন হল এমন প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাধ্যকতা থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে শিখনের একটি ব্যবস্থা।
- এই প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়মিত দলিলপত্র প্রেরণ, নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান, নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থাকরণ এবং লক্ষ্য দলের সকলকে তথ্যপত্র প্রেরণ, অবহিতকরণ ও সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

উন্মুক্ত শিখনের বৈশিষ্ট্য: উন্মুক্ত শিখনের কতগুলো সর্বজনীন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

- এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিখনের ধাপসমূহ অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা হয়।
- শিক্ষার্থীর স্ব-দর্শনে তার শিখন কার্য-পরিচালিত হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি সমগ্র সত্তাকে সম্পৃক্ত করে থাকে।
- উন্মুক্ত শিক্ষা, স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার নিশ্চিত করে।
- উন্মুক্ত শিক্ষায় ভর্তির কড়াকড়ি ও শিক্ষার ব্যাপ্তীকাল অনেকটা নমনীয়।
- শিক্ষার্থী নিজ ইচ্ছামত কোর্স নির্বাচন করতে পারে এবং তার সুবিধামত সময়ে কোর্স সমাপ্ত করে ডিগ্রি অর্জনের সুবিধা পায়।
- অধিক সংখ্যক শিখনের মাত্রা মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকায়, শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণি পাঠদানে পরিপক্কতা অর্জিত হয়।
- শিক্ষার্থী তার সুবিধামত যে কোনভাবে কোর্স বই পাঠ করে অবিরতভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সামর্থ হয়।

উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষার পার্থক্য

দূর শিক্ষা	উন্মুক্ত শিক্ষা
১. দূর শিখন পদ্ধতি এক ধরনের শিখন-শেখানো ব্যবস্থা যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষক থেকে বাস্তবিক পক্ষে বহুদূরে অবস্থান করে শিখনে অগ্রসর হয়।	উন্মুক্ত শিখনে প্রথাগত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক হতে মুক্ত হয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়। তবে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের নির্দেশনায় পাঠে অংশগ্রহণ করে।
২. দূর শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মত সহজে দৃশ্যমান নয়।	উন্মুক্ত শিখন একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া। একটি হলো দর্শন ও শিখন-শেখানো কতগুলো পদ্ধতির সমন্বিতকরণ। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষকগণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃশ্যমান।
৩. দূর শিখনে শিখনের ধারাধাহিক মূল্যায়ন সহজে পরিমাপ করা যায় না।	উন্মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের উপস্থিতিতে একাধিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীর অর্জন সহজে পরিমাপ যোগ্য।
৪. দূর শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিখনে সম্পৃক্ত হয়। যেমন– রেডিও, টেলিভিশন।	উন্মুক্ত শিখনে নানা প্রকার শিখন সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ থাকে। যেমন– প্রশিক্ষকের উপস্থিতিতে পাঠদান পর্যালোচনা, মুদ্রিত সামগ্রী, রেডিও টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি।
৫. দূর শিক্ষার ভত্যি শিক্ষার ব্যাপ্তিকার অনেক নমনীয়।	উন্মুক্ত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় ভর্তি ও শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল অনেক নমনীয়।

অতএব উচ্চশিক্ষার বাস্তবায়নে এবং প্রসারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তৎপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দূর শিক্ষা একটি–
   ক. একটি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া
   খ. জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া
   গ. একমুখী প্রক্রিয়া
   ঘ. আধুনিক প্রক্রিয়া

২. উন্মুক্ত শিক্ষা–
   ক. আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া
   খ. দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া
   গ. উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান
   ঘ. স্ব-শিখন প্রক্রিয়া

৩. দূর শিক্ষণে শিক্ষকের উপস্থিতি–
   ক. সরাসরি থাকে না
   খ. শিক্ষক দূর থেকে শিক্ষাদান করে
   গ. বাধ্যতামূলক
   ঘ. শিক্ষক বিহীন কার্যক্রম

৪. উন্মুক্ত শিক্ষণে শিক্ষা কার্যক্রম নির্ভর করে–
   ক. শিক্ষকের অনানুষ্ঠানিক দিক নির্দেশনার উপর
   খ. মুদ্রীত শিখন সামগ্রীর উপর
   গ. বিভিন্ন মাধ্যমের উপর
   ঘ. প্রতিষ্ঠানের উপর

৫. বর্তমান বিশ্বে কয়টি দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়–
   ক. ৭৫টি খ. ৬৫টি
   গ. ৯৫টি ঘ. ৯৯টি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
২. উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
২. উন্মুক্ত শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবৃত করুন।

পাঠ ৩.৭: উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উচ্চশিক্ষা বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা বলতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী তা আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

উচ্চশিক্ষা বলতে এমন একটি শিক্ষা স্তর যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে স্বতন্ত্র। অতএব এ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও স্তর বিবেচনায় সেভাবে পরিচালনা করতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হলে ও বর্তমানে তা উচ্চশিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কারণ সুশীল সমাজ গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষ নেতা সৃষ্টিকরণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়ক ও গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক শক্তি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সমারোহের সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই সার্বিক বিষয়ে প্রদত্ত শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই অনেকগুলো বিশেষ বিশেষ ধারায় উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উচ্চশিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দারুনভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

- দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশে উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে মানুষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাকে নির্বিকার চিত্তে প্রকাশ করার শক্তি যোগায় উচ্চশিক্ষা।
- দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, দেশবাসীর আচরণ, কর্ম-তৎপরতা, জীবনযাপন, বিশ্বাস ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন সুদীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই সংস্কৃতিকে নিজের মনে সংগঠিত করে আধুনিক যুগের উপযোগী করে চর্চা করতে মানুষকে সাহায্য করে– উচ্চ শিক্ষা।
- কল্পনা ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে এক, কল্পনার সাহায্যে জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগ করার নানা পন্থা অনুসন্ধান করে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ নানা প্রকার তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন।
- উচ্চশিক্ষা মানুষকে যে দক্ষতা দান করে এগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের সাহায্যে পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে সাহায্য করে।
- উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা যথোচিত নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের মানুষ তৈরির জন্য চাই পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা।
- উচ্চশিক্ষা জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্যময় দিক উন্মোচন করার সাধনা ও ব্যাখ্যা দেয়ার প্রচেষ্টাই সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রধান শর্ত যে শর্ত পূরণ ও উদ্যোগ গ্রহণ কেবলমাত্র উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।
- দক্ষ জনসংখ্যা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উপযুক্ত শিক্ষা ও নেতৃত্বের সাহায্যে মানুষের কর্মদক্ষতা যথাযথ ব্যবহার সম্ভব কেবল উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে।
- উপযুক্ত নেতৃত্ব ব্যতিরেকে কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোচন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে।
- উচ্চশিক্ষা মানুষকে নিরলস কর্মাভ্যাগ, নিরিবিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্পৃহা, উদ্যোগ, সততা, ন্যায়বোধ, মানবতাবোধ, নৈতিকতা, প্রগতিশীলতা, চিন্তাশীলতা, সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তা সমাধানের আকাঙ্খা জাগ্রত করে।
- বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিষয়ভিত্তিক যে কোন প্রান্তের জ্ঞান ও সৃজনশীল কর্মের সঙ্গে ই-লানিং, অনলাইন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা, মুক্তচিন্তা, চর্চা ও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্র পরিসর বৃদ্ধি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি?
ক. শিক্ষা
খ. উচ্চশিক্ষা
গ. পেশাগত উন্নয়
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২. জাতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ–
ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
খ. সামাজিক উন্নয়ন
গ. উচ্চশিক্ষিত জনগন
ঘ. দক্ষ জনসংখ্যা

৩. মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়–
ক. উপযুক্ত শিক্ষা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে
খ. তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে
গ. আর্থিক স্বচ্ছলতা
ঘ. নৈতিকতার মাধ্যমে

৪. শিক্ষার উন্নয়নে দারুনভাবে প্রভাবিত করে–
ক. নেতৃত্ব
খ. সঠিক দিক নির্দেশনা
গ. উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি
ঘ. উন্নত শিক্ষাক্রম

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক, ৪. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
২. উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ১৯৮৮ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।

পাঠ ৩.৮: বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কৃতিত্ব অভীক্ষা কী তা বলতে পারবেন।
- শিখনফল (Learning Outcomes) প্রান্তিক যোগ্যতা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা বাস্তবায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মূল্যায়ন যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক শিক্ষাদানকে কতটুকু ফলপ্রসূ করতে সফলকাম হয়েছেন তা সঠিক পরিমাপ করা যায় কেবলমাত্র শিখনফল মূল্যায়নের মাধ্যমে। সাধারণত পরীক্ষা শাসিত শিক্ষাব্যবস্থায় কৃতিত্ব অভীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। আর এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে একটি সামাজিক মর্যাদার সার্টিফিকেট লাভই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণতার জীবনযাপনের সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি এবং জীবনের সুষম বিকাশে পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত একটি গৌন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় এবং শিক্ষার স্তরে একটি নির্ধারিত শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করে পঠন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এই পঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মাঝে মধ্যে এবং কার্যক্রমের শেষে শিক্ষার্থী কতটুকু জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে এবং কি ধরনের মানসিকতা পোষণ করে তা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার ক্ষেত্রে অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, শিক্ষায় তাকে কৃতিত্বে অভীক্ষা বলা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে এই কৃতিত্ব অভীক্ষার দ্বারাই শিক্ষার্থীর মেধায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক ইত্যাদির পাশাপাশি জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ইত্যাদির যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলে, কোন ব্যক্তির সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

শিক্ষা হল ব্যক্তির জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের ছেদহীন প্রক্রিয়া যা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাকে তার পরিবর্তন মান পরিবেশের সাথে সুষ্ঠতম সঙ্গতিবিধানে সমর্থ করে; সমাজের প্রতি বহুমুখী কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে, তেমনি অপরদিকে তার অভ্যন্তরীণ সম্ভবনাগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করে তার নিজের ও সমাজের স্থায়ী মঙ্গল বিধানে সহায়তা করে। অর্থাৎ শিক্ষা হল ব্যক্তির জ্ঞান মূলক, সমাজমূলক, মানসিক ও ব্যক্তিগত প্রভৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বিশেষ।

শিক্ষা, শিক্ষাক্রম, বিষয়বস্তু, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় শিক্ষক সবই শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে আবর্তিত। কারণ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জন ও গুরুত্বপূর্ন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা তখনই সমৃদ্ধ হবে যখন শিক্ষক তাকে সক্রিয়াতার লক্ষে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। মূলত শিক্ষা সম্প্রসারণে দু'ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত রয়েছে। যেমন–

- শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি;
- শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় পাশাপাশি শিক্ষকের যথাযথ সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

শিক্ষক কেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষকই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন, শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসেবে পাঠ শুনে থাকে। শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে প্রাধান্য বা মূল্যায়ন করা হয় না বলে, শিখনফল যথার্থ হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের সার্বিকভাবে শ্রেণিকরণ সম্পর্কে একটি নৈতিবাচক ধারণা জন্মে।

শিখনফল (Learning Outcomes)

শ্রেণির পাঠদানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো কিনা তা হলো যার শিখন ফলের মাধ্যমে। সুতরাং শিক্ষন-শিখন কার্যক্রমে কতগুলো আচরনিক উদ্দেশ্য (Behavioural Objectives) থাকে সেগুলো যর্থার্থভাবে অর্জিত হওয়ার নাম শিখনফল (Learning Outcomes)। পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য হতে পারে–

- বিষয়টি কী, তা বলতে পারবে;
- বিষয়টি শ্রেণি বিভাগ করতে পারবে;
- বিষয়টি বিভিন্ন প্রকার নাম বলতে পারবে;
- বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারবে;
- বিষয়টি উদাহরণ দিতে পারবে;
- বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা

সাধারণত বিশ্বের সব দেশেই শিক্ষার সকল স্তরে লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাজ (Assignment) ও মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কি পরিমাণে এবং কি মাত্রায় বিষয়টি গ্রহণ করতে পেরেছে সেটা দেখা ও শিক্ষার একটি কাজ। শিক্ষার্থীর বর্ষ শেষে শিক্ষা গ্রহণের বা শিখনের এই পরিমাপকে প্রান্তিক যোগ্যতা বা মূল্যায়ন বলা হয়।

- মূল্যায়নের ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে। যেমন–
- শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ: (Diagnostic) ডায়াগনষ্টিক মূল্যায়ন
- গঠনমূলক উন্নয়ন সহায়ক: (Formative) গাঠনিক মূল্যায়ন
- সাবির্ক অগ্রগতি মূল্যান: (Summative) প্রান্তিক মূল্যায়ন

এর জন্য প্রয়োজন সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম-পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন। অতএব মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হল–

- সাধারণ উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ ও বর্ণনা;
- বিশেষ উদ্দেশ্য চিহ্নিতরণ ও বর্ণণা;
- মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচন ও উদ্ভাবন
- মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ;
- মূল্যায়ন ফলাফল ফলাবর্তন (Feedback) হিসেবে ব্যবহার।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

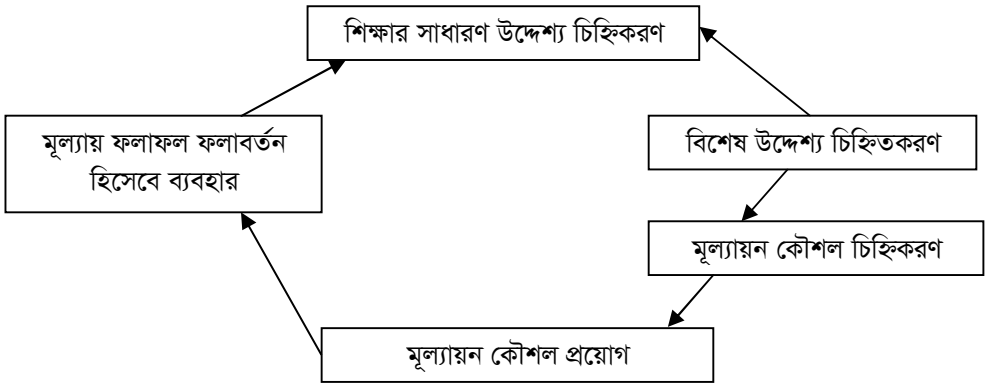

ছক: ৩.৪.১: মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ।

প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণের (প্রান্তিক মূল্যায়ন) পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রান্তিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য
- জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন পরিমাপ
- বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ ও শিক্ষকের দক্ষতা
- ভবিষ্যৎ সাফল্যের নিরূপক
- অর্জিত গুণাবলীর পরিমাপক
- শিক্ষা প্রচেষ্টার উদ্বোধক
- সুপরিচালনার মাধ্যম
- শিক্ষণ-শিখনে দুর্বলতা ও ত্রুটির নির্ণায়ক
- শিক্ষার্থীর আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ়করণ
- শ্রেণি বিন্যাসের সহায়ক
- নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ
- পারদর্শিতার পরিমাপ

এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ফলাবর্তন দেওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। চূড়ান্ত মূল্যায়ন সাধারণত আনুষ্ঠানিক একে আবার সামষ্ঠিক মূল্যায়ন ও বলা হয়।

কৃতিত্ব মূল্যায়ন কৌশল

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের কৌশলগুলোর উপযোগিতা সকল স্তরে সমান হয়। শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপে ভিন্ন ভিন্ন অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা বিদ্যমান। কারণ মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচনের উপরই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নের গুণগতমান অনেকাংশে নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশলগুলো হলো–

১. অভীক্ষা
২. স্ব-মূল্যায়ন কৌশল
৩. পর্যবেক্ষন কৌশল

১. **অভীক্ষা:** শিক্ষার্থীদের কোন কর্ম-সম্পাদনমূলক কাজ মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে অভীক্ষা বলে। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক অভীক্ষা দিয়ে বা মনোবৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা যায়।

২. **স্ব-মূল্যায়ন কৌশল:** শিক্ষার্থী নিজের সম্পর্কে বলার জন্য যে সুযোগ দেওয়া হয় সেগুলোকে স্ব-মূল্যায়ন কৌশল বলে। যেমন– ডায়রী লেখা, চেকলিস্টের মাধ্যমে স্বাক্ষাৎকার প্রশ্ন জিজ্ঞেস, আত্মমূল্যায়ন ইত্যাদি।

৩. **পর্যবেক্ষন কৌশল:** এটি একটি শক্তিশালী কৌশল। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণিক বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করা। যেমন– নেতৃত্বের গুণাবলী, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি।

বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা: করণীয়

১. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্তঃমূল্যায়ন (Quternal) ও বহি:মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী একাডেমিক বছরের শুরুতে নির্ধারণ করে তা অনুসরণ করতে হবে।

২. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ে উত্তরপত্র সংগ্রহের নিশ্চয়তা বিধান এবং সম্মানী যুগোপযোগী হতে হবে।

৪. পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের উদ্যোগী হতে হবে। এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিরোধিতায় কঠোর ব্যবস্থার পাশাপাশি আইনের বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

৫. ফলাফল নির্ণয়ে গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী পরীক্ষা পদ্ধতির পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিখনফল কী?
   ক. শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
   খ. এটি একটি পদ্ধতি
   গ. একটি কৌশল
   ঘ. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অর্জন

২. গাঠনিক মূল্যায়ন বলতে–
   ক. শিক্ষার্থীর শারীরিক উন্নয়ন
   খ. শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নয়ন
   গ. পারদর্শিতা অর্জন
   ঘ. সামগ্রিক শিক্ষা অর্জন

৩. কৃতিত্ব অভীক্ষণ সম্প্রসারণে কয় ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়-
   ক. ৪ ধরনের
   খ. ২ ধরনের
   গ. ৬ ধরনের
   ঘ. ৫ ধরনের

৪. শিক্ষার্থীর আচরণিক উদ্দেশ্য যথার্থভাবে অর্জিত হওয়ার নাম–
   ক. শিক্ষা
   খ. মূল্যায়ন
   গ. শিখনফল
   ঘ. পরিদর্শিতা

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. খ, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতার পার্থক্য লিখুন।
২. প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপের উপায়গুলো কি কি?
৩. মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার স্তরে প্রান্তিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করুন।
২. শিখনফল ও প্রান্তিক মূল্যায়নের তুলনামূলক বিবরণ দিন।

পাঠ ৩.৯: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
Curriculum Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম কী তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের কাজ বা ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ও নির্ধারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর শিক্ষাক্রম ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। কারণ শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার একটি অত্যন্ত অপরিহার্য উপাদান। ফলে এর প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী প্রবল আগ্রহ জন্মে। বিশ্বের অনেক দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই শিক্ষাক্রম বা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্পর্কে চল্লিশ দশকের শেষার্ধে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা রাফটেইলার (Ralf Taylor) সর্বপ্রথম ১৯৪৯ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে হিলডা তাবা (১৯৬২), হুইলার (১৯৬৭), কার (১৯৬৮), লিউই (১৯৭৭), ইরাট (১৯৭৫) সালে প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী সমাদৃত করে। ক্রমান্বয়ে এ সম্পর্কে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাঠক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনার নানা মাত্রা যোগ হয়। কারণ, শিক্ষাক্রম হয় শিক্ষাব্যবস্থার মূলকেন্দ্র।

বর্তমানে শিক্ষাক্রমকে আরও জীবন ঘনিষ্ঠকরণের লক্ষ্যে "শিক্ষার্থীকে" শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার নানা আবশ্যকীয় বিবেচ্য দিক সংযোজিত করা হচ্ছে: যেমন– শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, সমাজের চাহিদা, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় উন্নয়ন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়নের গতিধারায় সক্রিয় বাস্তবায়ন বিবেচনায় তবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় এবং এর প্রধান কাজ হলো শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা। সুতরাং শিক্ষাক্রম উন্নয়ন উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ কর্মকুশলীর কাজ। "Curriculum is a course of study laid down for the learners of a University or schools or in a wider sense, for institutions of certain standard."

শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে শিক্ষাসূচি ধার্য করে তাদের সমবায়কে সহায়তা করা হয় তাহাই শিক্ষাক্রম।

Whilehead বলেছেন, "There is only one subject matter for education and that is life is all its manifestations."

Kar, বলেছেন, All learning which is planned or guided by the school whether it is carried on in groups or individually inside or outside the school.

শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বা ও সমাজ সত্ত্বার অনুকূলে তার দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশের জন্য নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুর সমষ্ঠি।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর নবতর উদ্ভাবনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা শিক্ষার নবতর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার বিকাশ সৃষ্টি করেছে। অতএব, শিক্ষাক্রম হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সমপোযোগী, কর্ম ও চাহিদাভিত্তিক বিষয়াদিকে গতিশীল করে পুনর্গঠন করার একটি "রূপরেখা"। যা কেবলমাত্র শিক্ষাক্রম এর গতিশীলতাকে তরান্বিত করে। আর শিক্ষক হলেন এর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া পরিচালনার প্রধান সহায়ক। শিক্ষাক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অর্জনে পথ নির্দেশ করে। কারণ শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে একটি সুষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে পরিকল্পনা

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার শক্তিশালী ও কার্যকর পরিকল্পনা হলো– শিক্ষাক্রম। কারণ এই শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে–

- প্রয়োগশীলতার ভিত্তিতে বিষয় ও জ্ঞান অর্জনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সনাক্ত করা;
- সামাজিক চাহিদা ও ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিন্যাস করা;
- শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও ধারণ ক্ষমতানুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও কাজের মাত্রা ঠিক করা;
- কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদির চয়ন ও বিন্যাস করা;
- বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক, ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় বিধান করা;
- কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বমুখী অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা।

অতএব শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন। তবে কাজের প্রকৃতির উপর পরিকল্পনা নির্ভর করে। কারণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষাক্রম, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, পরিকল্পনাবিদ, মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সম্পৃক্ততা। তাই পাঠক্রম হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচ্য দিক

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে পরিকল্পনার স্তরে যে সব বিষয় গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা হল:

- পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে উন্নয়নের গতিধারা, জাতীয় দর্শন, শিক্ষা দর্শন, উন্নয়ন কর্মকান্ড, সামাজিক মূল্যবোধ ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক বিবেচনায় রাখা।
- সমাজের কাঙ্খিত মূল্যবোধ, চাহিদা, দেশ ও বিদেশে প্রযৌক্তিক পরিবর্তন ধারা, জাতীয় আদর্শ সমুন্নতকরণ।
- অতীত ও চলমান কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা।
- উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে উন্নীত শিক্ষাক্রম এবং পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণকে অবিহিতকরণ এবং সামাজিক প্রয়োজনে এর গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তাকরণ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ব্যক্তি ও সামাজিক চাহিদাক্রমেই বেড়ে চলেছে। এসব চাহিদা পূরনের জন্য প্রচলিত শিক্ষাক্রমে উন্নয়নে আরও নবধারার সংযোজন অপরিহার্য। যেমন–

- জাতীয়তাবোধ জাগ্রতকরণ;
- জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ;
- আর্ন্তজাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ;
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন;
- শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন;
- মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- স্ব-শিখন ও স্ব-কর্মসংস্থাকে উদ্বুদ্ধকরণ।

শিক্ষাক্রমের তত্ত্ব

মূলত চল্লিশ দশকের শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ফলে গত পাঁচ-ছয় দশকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের নানা তত্ত্ব, মডেল, পদ্ধতি ও কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়। শিক্ষাক্রমের বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত তত্ত্বগুলো হলো–

১. **রাফটেইলার (১৯৪৯) তত্ত্বঃ** এটি চার ধাপ বিশিষ্ট রৈখিকতত্ত্ব।
২. **হিলডা তাবা (১৯৬২) তত্ত্বঃ** এটি সাত ধাপ বিশিষ্ট রৈখিক তত্ত্ব।
৩. **হুইলার (১৯৬৭) তত্ত্বঃ** এটি পাঁচ অঙ্গ বিশিষ্ট বৃত্তাকার তত্ত্ব।
৪. **কার (১৯৬৮) তত্ত্বঃ** এটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি বিশদতত্ত্ব। চার অঙ্গ উদ্দেশ্য, জ্ঞানের ক্ষেত্র, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন উল্লেখ রয়েছে।
৫. **এরিহ লিউই (১৯৭৭) তত্ত্বঃ** লিউই তিন ধাপ ও দুই স্তর বিশিষ্ট তত্ত্ব প্রদান করেন।
৬. **লটন (১৯৭৪) তত্ত্বঃ** লটন শিক্ষাক্রম তত্ত্বের ও ব্যবহারিকের ব্যবধান কমিয়ে আনার একটি প্রবাহ চিত্র উদ্ভাবন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সহজীকরণ/সরলীকরণ।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

শিক্ষাক্রমের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে তত্ত্বের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মডেল অনুসারে বাস্তবরূপ দান করা হয়। অতএব শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান মডেলগুলো হল–

- প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডেল;
- উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল;
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ভিত্তিক মডেল;
- গবেষণা উন্নয়ন মডেল;
- সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া মডেল;
- সমস্যা সমাধান মডেল;
- ইরাট মডেল;
- ইউনেস্কো মডেল;

- সামাজিক দক্ষতা ভিত্তিক মডেল।

এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সাধারণত: যে সকল মডেল অধিকভাবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হল:

- **প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডের:** প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডেলে প্রথম প্রয়োজনীয় জ্ঞান বাছাই করে সে অনুসারে বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শিখন-কাল ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এটি অনেক পুরাতন মডেল যা ৩০/৪০ বছর আগে ব্যবহৃত হয়।
- **উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল:** এই মডেলের মূল ভিত্তি হল শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা, যেখানে জনজীবন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক অগ্রগতির ধারা, নবতর মূল্যবোধ, পরিবর্তিত জীবন ধারণ কৌশল ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়।
- **বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল:** এই মডেলের ভিত্তি হল, যাদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে তাদের চাহিদা কি, শিক্ষার মান কিরূপ, শিক্ষাকে কোথায় ব্যবহার করতে চায় ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে চাহিদা বিবেচনায় এনে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা এবং প্রণয়নে ছয়টি ধাপ অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপন, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রণয়ন, বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ, শিখন অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি নিরূপন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ট্রাই-আউট, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন এবং দেশব্যাপী বিতরণের জন্য মুদ্রণ।
- **রোনাল্ড হেভলক মডেল:** ১৯৯৭ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য তিন প্রকার কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে পৃথক তিনটি মডেল উদ্ভাবন করেছেন, মডেলসমূহ হল–
  - গবেষণা উন্নয়ন মডেল;
  - সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল;
  - সমস্যা সমাধান মডেল।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল: বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে গতিধারা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবর্তনসহ আধুনিক উন্নয়ন কৌশল বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই আধুনিক উন্নয়ন কৌশলটিতে পাঁচটি ধাপ অনুসৃত। যেমন–

- লক্ষ্য নির্ধারণ;
- পরিমাপযোগ্য ভাষার উদ্দেশ্য প্রকারকরণ;
- শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন;
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

শিক্ষাক্রম পরিবর্তন ও উন্নয়নকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা বা প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সময়কে সংগতি বিধান হিসেবে পরিবর্তন করা হয় না এ সঙ্গে আরও কতগুলো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। যা দেশের প্রচলিত শিক্ষানীতি, উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কতগুলো নির্ধারক চিহ্নিত করা হয়, নির্ধারকগুলোর মধ্যে বেশ পার্থক্য থাকলেও দুই/তিনটি নির্ধারক প্রায় সব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পাঠক্রম উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

উন্নত দেশেগুলোর শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারণগুলো দেশকে চরম উন্নতির পথে গতিশীল করে, আর উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাক্রমের নির্ধারকগুলো দেশের প্রয়োজনীয় জনসম্পদ তৈরি করে জীবনের গুণগতমান উন্নীত করে।

উন্নত বিশ্বে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারকঃ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি পরিবর্তনশীল ধারণা। উন্নত দেশে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনে বা উন্নয়নে যে সব দিক গুরুত্বারোপ করা হয় সেগুলো হল–

- শিক্ষা দ্বারা জাতিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা;
- দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের, শীর্ষে স্থাপনে লক্ষ্যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা;
- নবতর জ্ঞানার্জন ও বাস্তবায়নে তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করা;
- জাতির শ্রেষ্ঠ ও গুণীজনের, শিক্ষকের, অভিভাবকের চাহিদা বিবেচনা করা;
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক চাহিদাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নির্ধারক নিরূপনে সমকালের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ রোনাল্ড সি. ডল তার প্রবন্ধে "The multiple forces affecting curriculum change". উন্নত দেশের শিক্ষাক্রমে চারটি নির্ধারকের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দুই একটি নির্ধারক উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বা পরিবর্তনে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগঃ উন্নত বিশ্বে শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজে প্রভাবকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম পরিবতনের অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন–
   - শিক্ষার্থীর উপযোগী বিষয়বস্তু চয়ন পূর্বক প্রচলিত শিক্ষাক্রম নবায়ন করে নিজেদের উন্নয়ন কর্মী গড়ে তোলা।
   - বিদ্যালয় উর্ত্তীণ শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রকপূর্বক সংবেদনশীল, উৎপাদনক্ষম নাগরিক তৈরির জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
   - শিক্ষাক্রমকে মুক্তবুদ্ধি বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ. অর্থ উপার্জনের বাসনাঃ বস্তুবাদী সমাজে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। কারণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক হল– অর্থ।

গ. জনতার প্রয়োজনে শিক্ষার উন্নয়নঃ শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে প্রধান উপাদান হচ্ছে– শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য শিক্ষা সচেতন ব্যক্তির সম্মিলিত পরামর্শ দানের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ এসব ব্যক্তিরাই শিখন চাহিদা বিচার বিশ্লেষণ করেই প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিকগুলো দূরীকরণের উপায় অনুধাবন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয় সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

ঘ. জ্ঞান জগতের উন্নয়নঃ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ৪র্থ প্রভাবকারী নির্ধারক হল জ্ঞান জগতের উত্তোরত্তোর বৃদ্ধি। তাই শিক্ষাক্রমে সময়ের চাহিদা বিবেচনায় এনে এবং সচল রাখার জন্য নবতর জ্ঞানকে অর্ন্তভুক্তকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমের উন্নয়নে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারক

উন্নত দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারকসমূহ অনুরণ পূর্বক উন্নয়নশীল দেশসমূহ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সরকার কাঠামো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্ধারক চিহ্নিত করে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান নির্ধারকগুলো হল–

- শিক্ষাব্যবস্থার নবতর মাত্রা সংযোজন;
- জনসংখ্যার অভিক্ষেপ (Population Projection);
- প্রযৌক্তিক উন্নয়ন ধারা (Technological Development Trends);

- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে সমকালীন জীবনধারা (Contemporary life outside the institution);
- পরিবেশ সংরক্ষণ (Euvironmental Potection);
- নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন ও নারী পাচার (Enpowerment of women, violence againest women and trafticking);
- জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পারদর্শিতার শিখন (Skill development education);
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Natural disastev management)।

এছাড়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠির চাহিদা, সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার, মাদকসক্তি, অপরাধ নিরোধ ইত্যাদি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মকে উন্নীতকরণে প্রধান ও কার্যকর নির্ধারক হচ্ছে– শিক্ষাক্রম। যা শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক ও গতিশীল করে। অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল– পাঠক্রম। কারণ উন্নত ও আধুনিক ধারণা সমৃদ্ধ শিক্ষাক্রম ব্যতীত শিক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠ, ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ। যেমন–

- প্রায়োগিক জ্ঞান সম্মানিত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা;
- শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও কাজের মাত্রা ঠিক করা;
- সামাজিক চাহিদা ও ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে বিষয়বস্তু বিন্যাস করা;
- শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুসারে কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদির চয়ন ও বিন্যাস করা;
- বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্ক, ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় বিধান করা;
- শিখনের গুণগতমান উন্নয়নে শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা;
- কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বমুখী অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা;
- বিষয়বস্তু বিন্যাসে সহজ থেকে কঠিন নীতি অনুসরণ করা;
- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা;
- মৌলিক, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা;
- উচ্চশিক্ষার স্তরে, জ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা, গবেষণা লব্ধ জ্ঞানার্জন ও উচ্চশিক্ষা স্তরে গমনের পথ প্রশস্তকরণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু–
   ক. বিষয়বস্তু
   খ. শিক্ষক
   গ. শিক্ষাব্যবস্থা
   ঘ. শিক্ষার্থী

২. সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়াতত্ত্ব প্রদান করেন?
   ক. হিলডা তাবার
   খ. জন লিউই
   গ. রাফ টেইলার
   ঘ. ড. কুদরাত-ই-খুদা

৩. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো–
   ক. বিশেষজ্ঞ নিয়োগ
   খ. শিক্ষাব্যবস্থার উন্নীতকরণ
   গ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ
   ঘ. পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪. বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্রম উন্নয়নে চিন্তাভাবনা শুরু হয়–
   ক. তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর
   খ. পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে
   গ. চল্লিশ দশকের শেষার্ধে
   ঘ. সত্তরের দশকে

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বলতে কী বোঝায়?
২. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে আবশ্যকীয় বিবেচ্য দিকগুলো কি কি?
৩. শিক্ষাক্রমের একটি ধারণা উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অধিক ব্যবহৃত মডেলগুলোর বর্ণনা দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারকগুলো উল্লেখ করুন।

২. উচ্চতর শিক্ষাস্তরে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাগুলো লিখুন।

৩. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে পরিকল্পনার স্তরে কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা গুরুত্ব বলে আপনি মনে করেন। সেগুলো লিখুন।

৪. বর্তমান আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাক্রমের উন্নয়নে কি ধরনের নবধারার সংযোজন অপরিহার্য– তা লিখুন।

পাঠ ৩.১০: উচ্চশিক্ষার স্তরে মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মূল্যায়ন কী তা বলতে পারবেন।
- উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- মূল্যায়নের নীতি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা মূল্যায়ন যে কোন স্তরে শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের ফলপ্রসূ করার জন্য এবং উন্নতি বিধানে মূল্যায়ন অপরিহার্য। মূল্যায়ন চিন্তার দক্ষতার সবশেষ স্তর। তবে মূল্যায়ন কোনো একক নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নয়। এটা সার্বিক এবং অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড বিবেচনায় এনে কিছু নির্দেশকের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা নির্ধারন করা হয়। শিক্ষার্থী মূল্যায়নে সাধারণত পরিমানগত (Quantity) ও গুণগত (Quality) মূল্য আরোপ করা হয়। মূল্যায়ন উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা যার দ্বারা যে কোন বিষয়ে মন্তব্য, বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেখানে থাকতে হবে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ। বর্তমানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে একত্রে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রতিফলন রয়েছে।

মূল্যায়নের নীতিসমূহ (Principle of Evaluation)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কিছু মৌলিক নীতিমালা কার্যকর করা হয়।

- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি হলো আচরণিক পরিবর্তন।
- মূল্যায়ন হবে পরিমাপযোগ্য শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সাক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অনুভূতি স্তরের দক্ষতা ও জৈব মানসিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে (Teaching Learning Activities) মূল্যায়নের যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি এই কার্যক্রম মূল্যায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- ব্যক্তির আচরণগত পরিবর্তনগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। সুতরাং পরস্পর নির্ভরশীল আচরণগুলো বিচ্ছিন্ন পরিমাপের কৌশল দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এ জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামগ্রিক কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের কৌশলগুলোর সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এতে করে ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন হয়।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৮), পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে

বাস্তবায়নে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন এর আলোকে পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনায় নিম্ন উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন:

- উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়।
- নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুসরণে শিক্ষার্থী কি পরিমাণ জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগে সার্থক হয়েছে, তা নিম্নরূপ।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অসম্পূর্ণতা নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষনের মান নির্ধারণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ ও সংস্কার সাধন।
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্য পুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তা দান।
- শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকার কার্যকারিতা নিরূপণ, সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনে শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তন ও পুনবিন্যাস করা।
- শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ করে নিম্ন মানের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।
- শিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আস্থা সঞ্চার।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ভূমিকা বিবেচনা করলে দেখা যায় উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জিতকরণে ধারাবাহিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এক অপরিহার্য অঙ্গ এবং উন্নততর পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত। এর জন্য প্রয়োজন:

- উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ।
- শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
- উপযোগী শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহ।
- আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থা।
- শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নতি বিধানের পাশাপাশি দায়িত্ববোধের সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- আধুনিক বিশ্বের সাথে সমন্বয় রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন।
- উচ্চ শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নির্ধারণে সমতা আনয়ন ইত্যাদি।

শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়নে মূল্যায়নের তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে:

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নে মূল্যায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিতপূর্বক সহযোগিতার উপায় নির্ধারণ করা যায়।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিখনের অগ্রগতি পরিমাপ শেষে ফলাফল এর সনদ বা গ্রেড প্রদান করা যায়।
- শিক্ষার্থীর চিন্তন দ্বারা (Heads on), উন্মোচিত হয়, হৃদয় প্রসারিত হয় (Hearts on) এবং দক্ষ ও কর্মপটু (Hands on) হয়। ফলে পরবর্তীতে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়।

উচ্চশিক্ষা স্তরে মূল্যায়ন ব্যবস্থা

সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষা গ্রহণ, ব্যবস্থা, শিক্ষাকার্য ও গবেষণা কাজকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আলফ্রেড নর্থ, হোহাইট হেড তার "The aim of Education" পুস্তকে বহি: পরীক্ষক দ্বারা প্রশ্নপত্র

প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল নির্ধারণের ঘোর বিরোধিতা করেন, তিনি বলেছেন, যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন না অথচ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন, ফলাফল প্রকাশ করবেন সে প্রক্রিয়া যথার্থ হতে পারে না। যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাই উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে অন্তঃপরীক্ষকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে নিয়মিত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের জন্য দেয়া হলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তী উন্নীতকরণে সহায়ক হবে এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের আস্থা গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। বর্তমানে শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয় ফেল করলে বা অংশগ্রহণ করতে না পারলে পরবর্তী পরক্ষীয় সে বিষয় অংশগ্রহণের নিয়ম চালু রয়েছে।

অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন। এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষা পদ্ধতি এক হয় না। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভের পর দেশের সকল অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রদানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে চলে আসে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে এ সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা সম্ভব নয়। ফলে উক্ত কলেজগুলোর শিক্ষাক্রম শিক্ষা সূচি, পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্তায়। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ২ জন প্রণয়ন করেন এবং তা সমীক্ষণের মাধ্যমে দুই সেট প্রশ্ন থেকে এক সেট প্রশ্ন তৈরি করা হয়। পরীক্ষান্তে বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করে নম্বরের গড় নেওয়া হয়। দুই জনের নম্বরের পার্থক্য ২০% শতাংশের বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা তা মূল্যায়নের বিধান রয়েছে। এই তিনটি নম্বরের মধ্যে যে দুটি কাছাকাছি তার গড় নেওয়া হয়।

অনার্স কোর্সে, প্রতি পরীক্ষার্থীকে প্রতি বছরই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত চূড়ান্ত পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হয়। অনার্সের প্রতি বছরের ফলাফলকে সংরক্ষণ করা হয়। ৩ বা ৪ বছর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই তিন বা চার বছরের ফলাফলকে এক সঙ্গে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল অন্ত:পরীক্ষা ও বহি:পরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।

অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ নম্বর বা তদুর্ধ্বে। দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বর শতকরা ৪৫-৫৯ এবং তৃতীয় শ্রেণির নম্বর হবে ৩৫-৪৪ নম্বর পর্যন্ত। ৩৫ এর নিম্নে প্রাপ্ত নম্বরধারীরা অনুর্তীন বলে ধরে দেওয়া হবে।

ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা। যেমন, পরীক্ষার মান উন্নত করা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন মানোন্নয়ন ও আদর্শায়নের ব্যবস্থা করা, পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়ে নীতি নির্ধারণ, প্রযুক্তি নির্ভর উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা, শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরামর্শ দান, সৃজনশীল বিকাশে মূল্যায়নে আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ **উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্মুক্ত শিখন প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ভর্তি ও শিক্ষা ব্যাপ্তী ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ভর্তি ও শিক্ষা ব্যাপ্তীকাল এ ব্যবস্থায় অনেক নমনীয়। এছাড়া উন্মুক্ত শিক্ষায় বহু মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে ও নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করা।

বাধ্যতামূলক নয় বলে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা নিজ ইচ্ছামত কোর্স নির্বাচন করতে এবং তার সুবিধা মত সময়ে কোর্স সমাপ্ত করে ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পায়। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ পায় না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কর্মজীবনের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে নানা প্রকারে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্সে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছে।

উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ লেখক কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। পুস্তকগুলো মডিউল হিসাবে লিখিত হয় যা স্বশিখনে ও স্বমূল্যায়নে সহায়ক। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রণ বিভাগ কর্তৃক মডিউলগুলো মুদ্রণ করা হয়। বিভিন্ন বিভাগে ১২টি আঞ্চলিকে অফিস (আরআরসি) কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ভর্তি, পাঠ্য পুস্তক ও সংশ্লিষ্ট স্টাডি প্যাকেজ সরবরাহ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য বহু ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করা হয়। মুদ্রিত মড্যুল, পাঠ্য পুস্তক, অডিও-ভিডিও উপকরণ, রেডিও ও টিভি প্রোগ্রাম এবং টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের মাধ্যমে টিউটোরিয়াল সার্ভিস দেওয়া হয়।

সর্বশেষে শিক্ষার মান উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন মান নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মান নির্ধারনের জন্য বিভিন্ন কমিটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং শিক্ষার মান নির্ধারনের জন্য নিম্ন উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

- প্রতিষ্ঠানের মান ও কার্যকারিতা।
- গবেষণা ফলাফলের প্রতিফলন।
- অর্থায়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রশিক্ষণের অবদান।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক পর্যালোচনা।
- ফলাফলে গ্রেডিং স্কেল নির্ধারণ।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কর্মত/পরতা ও কর্মদক্ষতা যাচাই।
- নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সংগৃহীত সকল পরিসংখ্যানিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রাসঙ্গিক নীতি কাঠামো বিচার করে মূল্যায়ন করা হলো সত্যিকারের মূল্যায়ন বের করা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। কারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়। এদেরকে বিবেচনায় না এনে যতই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা হউক না কেন তা সার্থক লাভ করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মূল্যায়ন কী?
   ক. পরীক্ষা
   খ. টেষ্ট
   গ. অভীক্ষা
   ঘ. প্রক্রিয়া

২. মূল্যায়ন বলতে?
   ক. পরিমাণগত
   খ. সংখ্যাগত
   গ. লিখিত দক্ষতা
   ঘ. গুণগত মান

৩. উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশত–
   ক. শিক্ষাদান করা
   খ. উন্নত তর পরীক্ষা পদ্ধতি
   গ. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
   ঘ. তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থা

৪. উচ্চশিক্ষার স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে–
   ক. প্রতিষ্ঠানকে
   খ. পাঠদান পদ্ধতিকে
   গ. আন্ত:পরীক্ষাকে
   ঘ. উচ্চ ডিগ্রি সম্পন্ন শিক্ষককে

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ক, ৩. খ, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষার ভূমিকা কী? লিখুন।
২. কী কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের টিউটোরিয়াল সার্ভিস দেওয়া হয়।
৩. মূল্যায়নের তাৎপর্যগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করুন।

২. উচ্চশিক্ষাস্তরে মূল্যায়নের মৌলিক নীতিমালা কার্যকর করার উপায়গুলোর বর্ণনা দিন।

৩. শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে, গুণগত ও পরিমান গত মানউন্নয়নে মূল্যায়নের তাৎপর্য ও ভূমিকাগুলো উল্লেখ করুন।

৪. উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৫. শিক্ষার মান নির্ধারণে মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩.১১: উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন কী তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষার বিশ্লেষণধর্মী প্রক্রিয়াগুলো কী চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রেডিং পদ্ধতির যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা হল ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও উন্নয়ন যা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শিক্ষা যেহেতু একটি গতিশীল প্রক্রিয়া তাই ব্যক্তির আচরনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা শিক্ষার কাজ। ব্যক্তির এই ব্যক্তির পরিবর্তন ও বিকাশ কিভাবে সংগঠিত হয় তা জানার জন্য প্রয়োজন মূল্যায়নের। যা একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটুকু সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি পরিমান অর্জন করেছে তা জানা যায়।

শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়।

- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
- লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন ও নির্ধারণ;
- এ প্রচেষ্টা থেকে কি ফল পাওয়া গেল তা বিচার করা অর্থাৎ মূল্যায়ন করা।

এ মূল্যায়ন কেবল শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সার্থক বাস্তবায়নে শিক্ষক ও সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের ও মূল্যায়ন।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বহিঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা প্রচলিত। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শেষে বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হতো। যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন মূল্যায়ন কালে মেধা তালিকা প্রণয়নে সমস্যা। তাছাড়া ঐ ব্যবস্থা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ছিল না। সে সকল সমস্যার সমাধানকল্পে ২০০১ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে বিভাগ, মেধা তালিকা, স্টারর, লেটার মার্ক প্রভৃতির বিলুপ্তী ঘটে। প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং তা থেকে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ GPA নির্ধারিত হয় এবং উক্ত জিপিএ'র মান শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্দেশ করে। নিম্নে বর্তমানে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি ধাপসমূহ নিম্নরূপ–

ফলাফল প্রকাশে লেটার গ্রেডিং এর ধাপসমূহ:

লেটার গ্রেড	নম্বর ব্যবধান	গ্রেড পয়েন্ট
A^+	৮০-১০০	৫.০০
A	৭০-৭৯	৪.০০
A^-	৬০-৬৯	৩.৫০
B	৫০-৫৯	৩.০০
C	৪০-৪৯	২.০০
D	৩৩-৩৯	১.০০
F	০০-৩২	০.০০

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চালু গ্রেডিং পদ্ধতি

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিচালিত হয় বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে নিজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ভিত্তিক কোর্স পরিচালনা করে বছর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার বছরে কয়েকটি ইনকোর্স পরীক্ষা গ্রহণ করে। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেষ্টার ভিত্তিক কোর্স পরিচালনা করে ইনকোর্স, এসাইনমেন্টসহ বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে চালুরত গ্রেডিং পদ্ধতি নিম্নরূপ:

লেটার গ্রেড	নম্বর ব্যবধান	গ্রেড পয়েন্ট
A^+	৮০-১০০	৪.০০
A	৭৫-৭৯	৩.৭৫
A^-	৭০-৭৪	৩.৫০
B^+	৬৫-৬৯	৩.২৫
B	৬০-৬৪	৩.০০
B^-	৫৫-৫৯	২.৭৫
C^+	৫০-৫৪	২.৫০
C	৪৫-৪৯	২.২৫
C^-	৪০-৪৪	২.০০
D	৩৫-৩৯	১.৫০
E	৩৫ এর নিচে	০০
F	অসম্পূর্ণ	

গ্রেডিং পদ্ধতির যৌক্তিকতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মানের সমতা বিধান এরূপ গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য। যদি ও এ পদ্ধতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। ব্যবস্থাটি পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে সমানভাবে চালু হলে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নত ও বিশ্বমানের হবে বলে আশা করা যায়। তবে এদের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করতে হবে।

ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব। যার মূল কাজ হবে পরীক্ষার মান উন্নয়ন করা। এবং এই গবেষণা সংস্থার মূখ্য দায়িত্ব হবে।

- প্রশ্নপত্রের মানোন্নয়নে প্রতি বছরের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করা এবং এর উন্নয়ন সাধনের সুপারিশ করা এবং ক্রমান্বয়ে প্রশ্নগুলোর আদর্শায়নের ব্যবস্থা করা।
- পরীক্ষা কেন্দ্রের সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তদারকি ও সংস্কার।
- উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- উত্তরপত্র মূল্যায়ণ ও মানের সমন্বয় বিধানের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।
- গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পরামর্শ দান।
- পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল বিকাশের বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করা এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা।
- নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তুতি এবং পরবর্তীতে অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই গবেষণা সংস্কার পরামর্শ মত গ্রহণ করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মূল্যায়ন কী?
   ক. পরীক্ষা
   খ. অভীক্ষা
   গ. শিক্ষার্থীর অর্জন পরিমাপ
   ঘ. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

২. শিক্ষা প্রক্রিয়াকে কয় স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়–
   ক. ৫
   খ. ৪
   গ. ৩
   ঘ. ৭

৩. বাংলাদেশে গ্রেডিং পদ্ধতি কত সালে প্রবর্তিত হয়–
   ক. ১৯৭৫ সালে
   খ. ১৯৮৮ সালে
   গ. ২০০৫ সালে
   ঘ. ২০১০ সালে

৪. G.P.A বলতে কী বোঝায়–
   ক. Gross Point Assessment
   খ. Grade Point Average
   গ. Good Point Account
   ঘ. Grade Per Average

উত্তরমালা: ১. গ, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গ্রেডিং পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
২. গ্রেডিং-এর ধাপসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার উন্নয়নে বিশ্লেষণ ধর্মী প্রক্রিয়াগুলো কি কি? বর্ণনা করুন।
২. উচ্চশিক্ষার স্তরে গ্রেডিং পদ্ধতির যৌক্তিকতাগুলো উল্লেখ করুন।
৩. উচ্চশিক্ষার স্তরে গ্রেডিং পদ্ধতির ধাপগুলো ছক আকারে লিপিবদ্ধ করুন।